ইউনিট

৪ আর্য সভ্যতা

ভূমিকা

সিন্ধু সভ্যতার পতনের পর একটি জাতি ভারতে প্রবেশ করতে থাকে । ইতিহাসে এরা আর্য নামে পরিচিত। আর্যদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম বেদ। বেদের ধর্ম খুব নিষ্ঠার সাথে পালন করতো আর্যরা। বেদের অনুসারী এই আর্যরা ভারতে গড়ে তোলে এক সভ্যতা। ইতিহাসে তা আর্য সভ্যতা বা বৈদিক সভ্যতা নামে পরিচিত। বেদ শুধু ধর্ম গ্রন্থই ছিল না। এতে সাহিত্যের গুণও ছিল। এভাবে আর্য সভ্যতা ভারতবর্ষে এক উন্নত সাহিত্যের জন্ম দেয় যা বৈদিক সাহিত্য নামে পরিচিত। আর্য সভ্যতা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে একটি নতুন ধারণার জন্ম দিয়েছিল। এই সভ্যতাই ধাতু যুগের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় ভারতকে।

পাঠ ১

আর্যদের পরিচয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- ভাষা বিশ্লেষণ করে পণ্ডিতগণ কিভাবে আর্যদের আদি বাসস্থান নির্ধারণ করেছেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- আর্যদের দেহ আকৃতি ও সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করে তাদের আদিবাস সম্পর্কে যে ধারণা নেয়া হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কিভাবে আর্যদের ভারতে আগমন ঘটেছে তার বিবরণ দিতে পারবেন।

পরিচয়

সিন্ধু সভ্যতার পতনের পর এক দল বিদেশী আক্রমণকারী ভারতে প্রবেশ করে। তারা নিজেদের আর্য বলতো। আর্য শব্দের অর্থ হচ্ছে 'বিশ্বস্ত মানুষ' বা 'একই জাতের মানুষ'। বেদ রচনাকারী এবং বেদের অনুসারী বলে আর্যদের মধ্যে খুব অহঙ্কার ছিল। তারা ভারতের স্থানীয় অধিবাসীদের চেয়ে নিজেদের উন্নত মনে করতো। তারা যে আলাদা তা বোঝানোর জন্যই নিজেদের 'আর্য' বলতো। ভারতের আদি অধিবাসীদের আর্যরা মনে করতো শত্রুন। তাই এদের বলতো 'দাস' বা 'দস্যু'।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা

ভাষার বিচারে আর্যদের আদিবাস অন্বেষণ

আর্যদের আদিবাস কোথায় ছিল তা নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে রয়েছে নানা মতভেদ। কারো মতে বাইরে নয় ভারতেই আর্যদের আদিবাস ছিল। কোন এক কালে ভারত থেকেই তারা পারস্য ও ইউরোপে যায়। কিন্তু, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পণ্ডিত এই মত সমর্থন করেন না। এ বিতর্ক থেকে বেরিয়ে এসে সঠিক সত্য খোঁজার জন্য প্রথম পদক্ষেপ নেন ভাষাতত্ত্ববিদগণ। প্রাচীন আর্য সংস্কৃতি খুঁজে পাওয়ার জন্য ভাষার নিদর্শনসমূহ পরীক্ষা করা হয়। তবে আর্য সংস্কৃতির উৎস হিসেবে কোন অঞ্চলকে নির্দিষ্ট করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসেন দু'জন ইউরোপীয়। তাঁরা আর্যদের ব্যবহার করা সংস্কৃত ভাষার সাথে ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষার মিল খুঁজে পান। এঁদের একজন হচ্ছেন ফরাসি মিশনারী কোরদু (Coeurdoux) এবং আরেকজন হলেন কোলকাতা সুপ্রিম কোর্টের ইংরেজ বিচারপতি ও এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়াম জোনস্। তাদেঁর ধারণা এই ভাষাসমূহের উৎস একই অঞ্চলে এবং কোন এক সময় এই অঞ্চলের মানুষেরা পূর্ব ও

পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়েছিল। একই উৎস থেকে উদ্ভব হয়ে বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন নামে ভাষাসমূহ ছড়িয়ে পড়ে। তাই ভাষার এই মূল উৎসটিকে বলা হয় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা। ইন্দো-ইউরোপীয়দের আদিবাস যেখানে ছিল আর্যদের উৎসও সেখানে। তবে এই প্রশ্নেও একমত হতে পারেননি পণ্ডিতগণ। এ পর্যায়ে কেউ বলেছেন, ইন্দো-ইউরোপীয়দের আদি বাসস্থান ছিল উত্তর ইউরোপের সমভূমিতে। কেউ বলেছেন, হাঙ্গেরীর সমভূমিতে। আবার কারও মতে মধ্য এশিয়ায়।

আর্যদের দেহ আকৃতি ও বিভিন্ন অঞ্চলে আর্যদের ছড়িয়ে পড়া

উৎস সন্ধ্যান

আর্যদের দেহ আকৃতি ও তাদের সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আর্যদের আদি বাসস্থান খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে, পোল্যান্ড থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ, শুষ্ক, তৃণময় প্রান্তরে আধা যাযাবর এক গোষ্ঠী বসবাস করতো। এই জাতির গড়ন ছিল লম্বা, নাক ছিল খাড়া, গায়ের রং ফর্সা আর মাথা লম্বাটে। তারা ঘোড়াকে বশ মানায় এবং চাকাওয়ালা রথ ব্যবহার করে। তাদের প্রধান পেশা ছিল মেষ পালন করা। সামান্য কৃষিকাজও করতো। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দের প্রথমদিকে আর্যদের জনসংখ্যা খুব বেড়ে যায়। অন্যদিকে, খরায় পশুচারণ ভূমির ঘাস যায় পুড়ে। ফলে, বাঁচার তাগিদে এ অঞ্চলের মানুষদের বেরিয়ে পড়তে হয় নতুন ভূমির সন্ধানে। দলবদ্ধভাবে তারা সরে যেতে থাকে পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে। তারা যে সমস্ত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে সেখানে শুরু হয় পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা। তাদের উপাসনায় স্থান পায় আকাশের দেবতা, ঘোড়া আর রথ। এই গোষ্ঠীর একটি শাখা চলে যায় ইউরোপে। এরাই হল গ্রিক, ল্যাটিন, কেলট এবং টিউটন জনগোষ্ঠীর পূর্ব পুরুষ। অন্য একটি শাখা চলে যায় আনাতোলিয়া অঞ্চলে। তাদের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের মিশ্রণে স্থাপিত হয় হিট্টাইটদের বিশাল সাম্রাজ্য। আর্যদের একটি শাখা তাদের পুরাতন বাসস্থানে রয়ে যায়। একটি শাখা চলে যায় দক্ষিণ দিকে ককেশাস এবং ইরানের সমতল ভূমিতে। খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ অব্দে উত্তর-পূর্ব সিরিয়াতে মিতান্নি নামের লোকদের আর্বিভাব ঘটে। এদের দেবতাদের সাথে ভারতীয় দেবতাদের মিল রয়েছে। যেমন- ইন্দর অর্থাৎ ইন্দ্র, উরুভন অর্থাৎ বৈদিক দেবতা বরুণ ইত্যাদি।

আর্যদের ভারতে প্রবেশ

ইরানের মালভূমি অঞ্চল থেকে আর্যদের ভারতে আগমন ঘটে।

ইরানের মালভূমি অঞ্চল থেকে আর্যদের ভারতে আগমন ঘটে। ভারতে আর্যদের আগমন ও অভিযান চলতে থাকে ধীরে ধীরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। এই আগমনের সূচনা ঘটে খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে। প্রথমদিকে আর্যবসতি গড়ে উঠে পূর্ব পাঞ্জাবে এবং শতদ্রু ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে। এই অঞ্চল আর্যাবর্ত নামে পরিচিত। আর্যরা ক্রমে স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে মিশে যেতে থাকে। এভাবে দেহের দিক থেকে তাদের অনেকটা পরিবর্তন দেখা যায়। এই মিশ্রণের মধ্য দিয়ে ভারতে এক সময় একটি উচ্চতর সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। যেখানে আর্য ও দ্রাবিড় রীতির অনেক কিছুই খুঁজে পাওয়া যায়।

সার-সংক্ষেপ

আর্যরা ভারতেরই আদি অধিবাসী না বহিরাগত এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। অধিকাংশ মত অনুযায়ী আর্যরা বিদেশ থেকে এসেছে। পন্ডিতদের মধ্যে পরবর্তী বিতর্ক শুরু হয় আর্যদের আদিবাস কোন অঞ্চলে ছিল তা নিয়ে। এভাবে সত্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভাষাতাত্ত্বিকগণ ভাষা বিশ্লেষণ করেছেন। নৃ-তাত্ত্বিকগণ আর্যদের দেহাকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। আর ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ আর্য সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করে তাদের উৎস ভূমি খোঁজার চেষ্টা করেছেন। দেখা গিয়েছে, আর্যরা মূল উৎস থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এদেরই একটি শাখা এক সময় ইরানের মালভূমি থেকে অগ্রসর হয় এবং প্রবেশ করে ভারতে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। আর্যরা ভারতের আদি অধিবাসীদের বলতো–
ক. বিশ্বস্ত মানুষ।
খ. দস্যু।
গ. একই জাতের মানুষ।

২। ভাষার বিচারে আর্যদের উৎস অনুসন্ধান করেছিলেন–
ক. স্যার উইলিয়াম জোনস্।
খ. স্যার মর্টিমার হুইলার।
গ. রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়।

৩। আর্যরা ভারতে আগমন করে–
ক. খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ অব্দে।
খ. ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে।
গ. ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

৪। ভারতে আসার পূর্বে আর্যদের বাসভূমি ছিল–
ক. ইরানের মালভূমি অঞ্চলে।
খ. দক্ষিণ ককেশাস অঞ্চলে।
গ. সিরিয়াতে।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. আর্যদের পরিচয় লিখুন।
২. ভাষার বিচারে আর্যদের আদিবাস কোথায় ছিল বর্ণনা করুন।
৩. কিভাবে আর্যদের ভারতে আগমন ঘটেছে তা আলোচনা করুন।

পাঠ ২

বৈদিক সাহিত্য : ঋগ্‌বেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- ঋগ্‌বেদ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- বৈদিক সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণ বর্ণনা দিতে পারবেন।
- বিভিন্ন বৈদিক সাহিত্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

ঋগ্‌বেদের পরিচয়

আর্যদের সম্পর্কে প্রথম জানার সুযোগ হয় তাদের ধর্মীয় সাহিত্য গ্রন্থ ঋগ্‌বেদ থেকে। আর্যদের সাথে বেশ কিছু পুরোহিতও এসেছিলেন ভারতে। তাঁরা কবিতা রচনায় ছিলেন দক্ষ। এসব কবিতা দেবতাদের উদ্দেশ্যে রচনা করা হতো এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তা গাওয়া হতো। আর্য পুরোহিতদের দ্বারা রচিত শ্লোকগুলো ভারতবর্ষে শুরুর দিকে মুখে মুখে আবৃত্তি করা হতো। খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দে এগুলো একত্র করে সাজানো হয়। অবশ্য তখনও লিখে রাখার কথা ভাবা হয়নি। ভারতে লেখার প্রচলন হওয়ার পরে কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে শ্লোকগুলো লেখা হতে থাকে। তবে, অধিকাংশ শ্লোকই ব্রাহ্মণদের স্মৃতিতেই থেকে গিয়েছিল। এভাবে প্রায় ৩০০০ বছর ধরে অনেকটা অবিকৃতভাবে ঋগ্‌বেদের শ্লোকগুলোকে রক্ষা করা হয়। ঋগ্‌বেদের মোট শ্লোকের সংখ্যা ১০২৮ টি। ঠিক কোন সময় শ্লোকগুলো রচিত হয়, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মূলতঃ আর্য আগমনের সময় সাথে আসা পুরোহিতরাই শ্লোকগুলো রচনা করেছেন।

ঋগ্‌বেদের মোট শ্লোকের সংখ্যা ১০২৮ টি।

বেদের শ্লোকের সংখ্যা

এ, এল, ব্যাশামের মতে, শ্লোকগুলো রচিত হয় খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দের মধ্যে। এগুলো একত্রে সাজানো হয় খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দে। আপনারা জেনেছেন যুগ যুগ ধরে মুখে মুখে আবৃত্তি করা হতো 'বেদ'। বলা হয়ে থাকে ব্রাহ্মণের মুখ থেকে বেদের বাণী শুনে পূণ্য লাভ করতো অনুসারীরা। এই জন্য বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'। এ কারণে, ঋগ্‌বেদ হিন্দু সভ্যতার আদি গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত। ঋগ্‌বেদ গ্রন্থবদ্ধ হওয়ার পর এর ভেতর ১০০০ এরও বেশি শ্লোক অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শ্লোকগুলো লেখা হয়েছিল প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায়, যাকে বৈদিক সংস্কৃত বলা হয়। ঋগ্‌বেদ হচ্ছে আর্য সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন।

ঋগ্‌বেদ গ্রন্থবদ্ধ হওয়ার পর এর ভেতর ১০০০ এরও বেশি শ্লোক অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বৈদিক যুগের বিভিন্ন সাহিত্য

ভারতে বসতি স্থাপনের পর আর্যরা আরও অনেক ধর্মীয় সাহিত্য রচনা করে। যেমন- বেদ, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও সূত্র। এই বিপুল সাহিত্য সম্ভার বৈদিক সাহিত্য হিসেবে পরিচিত। বৈদিক সাহিত্যসমূহ খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দের মধ্যে লিখিত হয়েছিল বলে অনেক পন্ডিতের অভিমত। এই বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করেছেন জার্মান পণ্ডিত ফ্রিডরিচ ম্যাক্স মুলার (১৮২৩-১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি উপনিষদকে মানুষের জ্ঞানের উজ্জ্বল প্রকাশ বলে মন্তব্য করেছেন। বৈদিক সাহিত্য পড়লে বুঝা যায় কিভাবে প্রাচীন ভারতের মানুষ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগে এসে পৌঁছেছিল।

বৈদিক সাহিত্যসমূহ খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দের মধ্যে লিখিত হয়েছিল বলে অনেক পন্ডিতের অভিমত।

চার প্রকার বেদ

ঋগ্‌বেদ ছাড়াও আরও তিনটি বেদ রচিত হয়। সুতরাং বেদ মোট চারটি - ঋগ্‌বেদ, সাম্‌বেদ, যজুরবেদ ও অথর্ববেদ। ঋগ্‌বেদের কিছু শ্লোক নিয়ে সাম্‌বেদ রচিত হয়। বৈদিক শ্লোককে কখনও কখনও বলা হয় 'মন্ত্র'। সাম্‌বেদের মন্ত্রগুলো যজ্ঞের সময় সঙ্গীতরূপে গাওয়া হতো। যর্জুবেদের কিছু অংশ পদ্যে ও কিছু অংশ গদ্যে রচিত হয়। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতো যজ্ঞের আচার আচরণ পালনের মন্ত্রগুলো। অথর্ববেদের মন্ত্রগুলোয় সৃষ্টির রহস্য, শত্রুদমন, চিকিৎসা পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বেদ মোট চারটি - ঋগ্‌বেদ, সাম্‌বেদ, যজুরবেদ ও অথর্ববেদ।

প্রতিটি বেদ আবার দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। শ্লোকের সংগ্রহ যে ভাগে তাকে বলা হয় সংহিতা। আর, যাগযজ্ঞ করার বিধি যে ভাগে তাকে বলা হয় ব্রাহ্মণ। মন্ত্রের রচয়িতা ও প্রবর্তক হিসেবে দশজন ঋষির নাম পাওয়া যায়। এঁরা হচ্ছেন অষ্টক, বামক, বামদেব, বিশ্বমিত্র, জামদগ্নি, অঙ্গীরস, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কশ্যপ এবং ভৃগু।

উপরের আলোচনায় বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে ধারণা পেয়েছেন। এখন এই সাহিত্যগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হচ্ছে।

সংহিতা

কতগুলো বিষয়ের সমষ্টি ছিল সংহিতা। যেমন- মন্ত্র, প্রার্থনা ও আর্শীবাদের বাণী। সংহিতা ভাগের মন্ত্রগুলো পদ্যে রচিত। এগুলো রচনা করা হয়েছিল দেব-দেবীদের উদ্দেশ্যে।

ব্রাহ্মণ

এই ভাগে যাগযজ্ঞ সম্বন্ধে নানা আচার অনুষ্ঠানের বর্ণনা রয়েছে। বেদকে ভিত্তি করেই ব্রাহ্মণ অংশ গদ্যে রচিত।

আরণ্যক

বৈদিক সাহিত্যে ব্রাহ্মণ ভাগের পরিশিষ্ট হচ্ছে- 'আরণ্যক' ভাগ। এখানে 'ঐতরেয় আরণ্যক' ও 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' নামে দুই ধরণের রচনা দেখা যায়। অরণ্য বা বন সম্পর্কিত রচনা বলে এগুলোর নাম হচ্ছে 'আরণ্যক'।

উপনিষদ

আর্যদের দার্শনিক চিন্তা নিয়ে উপনিষদ রচিত হয়েছে। এই গ্রন্থে পরম সত্য ও সত্ত্বা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। উপনিষদ অত্যন্ত সরলভাবে ধর্ম পালনের নির্দেশ দিয়েছে। এখানে ধর্ম পালনে নানারকম যাগযজ্ঞের বিরোধিতা করা হয়। উপনিষদ গদ্যে লিখিত। এর অল্প কিছু অংশ ছিল পদ্যে। উপনিষদের সংখ্যা একশতেরও বেশি।

সূত্র

সূত্র সাহিত্য রচিত হয় উপনিষদের পরবর্তীকালে। এই সূত্র সাহিত্য তিন ভাগে বিভক্ত ঃ শ্রৌত সূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্র। বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান সূত্রাকারে বর্ণিত হওয়াকে 'শ্রৌতসূত্র' বলে। 'গৃহ্যসূত্র' হচ্ছে গৃহস্থের কর্তব্যকর্ম অন্নপ্রাসন, উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি সুত্রাকারে বর্ণিত হওয়া। আর সামাজিক রীতিনীতি, আচার ব্যবহার ইত্যাদি সূত্রাকারে বর্ণিত হওয়াকে ধর্মসূত্র বলে। এই তিনটি প্রধান সূত্র ছাড়া আর এক ধরণের সূত্র পাওয়া যায়, তাকে বলে 'শুল্বসূত্র'। 'শুল্ব' শব্দের অর্থ হচ্ছে সুতো। অর্থাৎ যেখানে যজ্ঞদেবীর মাপ, আকার, আয়তন ইত্যাদি বর্ণিত আছে তা হল 'শুল্ব সূত্র'।

সার-সংক্ষেপ

বৈদিক যুগ সম্পর্কে জানার পূর্বে বৈদিক সাহিত্য জানা প্রয়োজন। কারণ সাহিত্যের ভিতরে ছড়িয়ে আছে সে সময়ের ইতিহাস। বৈদিক সাহিত্যের আদি নিদর্শন ঋগ্‌বেদ। ঋগ্‌বেদের ভেতর ছড়িয়ে আছে বৈদিক যুগের নানা কথা। ঋগ্‌বেদ ছাড়াও আরও বেশ কিছু সাহিত্য পাওয়া যায় আর্য যুগে। এই সাহিত্যগুলোর ভেতর সে যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের কথা ছড়িয়ে আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। ঋগ্‌বেদের শ্লোকগুলো প্রথম একত্র করে সাজানো হয়–
   ক. ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।
   খ. ১০২৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।
   গ. ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

২। ঋগ্‌বেদে মোট শ্লোকের সংখ্যা–
   ক. ১০০০ টি।
   খ. ১৫০০ টি।
   গ. ১০২৮ টি।

৩। বেদ মোট–
   ক. তিন প্রকার।
   খ. চার প্রকার।
   গ. পাঁচ প্রকার।

৪। উপনিষদ হচ্ছে–
   ক. আর্যদের কাব্য গ্রন্থ।
   খ. আর্যদের দর্শন গ্রন্থ।
   গ. আর্যপুরে হিতদের আশীর্বাদের বাণী।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. ঋগ্‌বেদ কি? আলোচনা করুন।
২. বেদ কত প্রকার? এর উপর একটি টীকা লিখুন।
৩. উপনিষদ সম্বন্ধে একটি টীকা লিখুন।
৪. সূত্র সাহিত্য কত প্রকার? এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

পাঠ ৩

ঋগ্‌বেদ যুগে আর্যদের রাজনৈতিক অবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- ঋগ্‌বেদ যুগে রাজ্য ও রাজার অবস্থান কি ছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- গুরুত্বপূর্ণ রাজ কর্মচারীদের সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রশাসনের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

রাজার অবস্থান এবং গ্রামণী

আর্যদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য তেমন ছিল না। তারা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। প্রতিটি গোষ্ঠী পরিচালনা করতেন এক একজন নেতা। এই নেতার উপাধি ছিল রাজা। রাজা উপাধি ধারণ করে তিনি তাঁর অঞ্চল শাসন করতেন। আর্যদের এই শাসন পদ্ধতি থেকে ধীরে ধীরে ভারতে রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়। ঋগ্‌বেদে এমন একজন রাজার কথা জানা যায়। তাঁর নাম 'সুদাস'। আর্যদের অন্যতম একটি গোষ্ঠীর নাম 'ভার গোষ্ঠী'। এই গোষ্ঠীর রাজা ছিলেন সুদাস। অঞ্চলটির অবস্থান ছিল স্বরস্বতী নদীর উৎস মুখে। ঋগ্‌বেদ থেকে জানা যায় সুদাস পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে দশটি গোত্রকে পরাজিত করেন। এই দশ গোত্রের মধ্যে 'পুরু' ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। পুরুর রাজার নাম ছিল 'পুরুকুতসা'। পরবর্তীকালে আরেকটি রাজ্য প্রাধান্য বিস্তার করে। এই রাজ্যের নাম কুরু। আর্য গোত্রগুলোর কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করতেন রাজা। রাজার পুত্রই রাজা হতেন। রাজারা এভাবে বংশানুক্রমিক ধারায় রাজত্ব করতেন। তারা সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদে বাস করতেন। রাজদরবারে তার চারপাশে থাকতেন সভাসদগণ। সভাসদ ছাড়াও গ্রামের প্রধান ব্যক্তিরা ছিলেন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের বলা হতো গ্রামণী। প্রজাপালন করা এবং যাগযজ্ঞ করার জন্য পুরোহিতদের পৃষ্ঠপোষণ করা ছিল রাজার কর্তব্য। রাজা অর্থ সংগ্রহ করতেন দুই পদ্ধতিতে। একটি প্রজাদের দেয়া দান। অন্যটি পরাজিতদের কাছ থেকে আদায়কৃত কর।

গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদের বলা হত গ্রামনী

গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারী

রাজার পরে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ছিলেন 'প্রধান পুরোহিত'। তিনি ছিলেন রাজার ঘনিষ্ঠ সহযোগী। আর্যরা রাজাকে দেবতার মতো পূজা করতো। তাদের বিশ্বাস মতে, যুদ্ধজয়ের জন্য দেবতারা রাজা নির্বাচন করে দিতেন। ঋগ্‌বেদের যুগে দু'জন মুনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিলেন। তাঁরা হলেন 'বৈশিষ্ঠ' এবং 'বিশ্বামিত্র'। তাঁরা গোষ্ঠীপতিদের কাজে অনুপ্রেরণা যোগাতেন। তাঁরা যুদ্ধ জয়ের উদ্দেশ্যে বন্দনা গান গাইতেন। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারীদের মধ্যে 'সেনানিদের' নাম করা যেতে পারে। এরা বল্লম, কুঠার, তরবারি ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। ধারণা করা হয়, রাজস্ব সংগ্রহের জন্য কোন নির্দিষ্ট কর্মচারী ছিল না। এ থেকে মনে করা হয় সাধারণ মানুষ স্বত:স্ফূর্তভাবে রাজাকে ধন-সম্পদ দান করতেন। এই দানকে বলা হতো 'বলি' বা 'বালি'। যুদ্ধ জয়ের পর যে উপঢৌকন ও জিনিসপত্র পাওয়া যেতো তা গোষ্ঠী সংগঠনগুলোর মাধ্যমে বিতরণ করা হতো। বিচারকার্য নির্বাহ করার জন্য কোন কর্মচারীর উল্লেখ ঋগ্‌বেদে নেই।

বজ্রপতি

কর্মচারীদের উপাধি থেকে ঋগ্‌বেদ যুগের প্রশাসন সম্পর্কে কিছু ধারণা লাভ করা যায়। তবে, উপাধি থেকে কোন্ কোন্ অঞ্চল তাদের শাসনাধীনে ছিল তা জানা যায় না। অবশ্য কোন কোন অঞ্চল কখনও কোন কর্মচারীর অধীনে দেয়া হতো। পশুচারণ ভূমি যে কর্মচারীর অধীনে থাকতো তার উপাধি ছিল 'বজ্রপতি'। পরিবার প্রধানকে বলা হতো 'কুলপ'। কুলপ এবং সৈন্যবাহিনী বা গ্রামণীদের নেতৃত্ব দিতেন এই বজ্রপতি। প্রথমদিকে গ্রামণীদের অধীনে থাকতো ছোট ছোট যোদ্ধাবাহিনী। পরে তাদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তারা হন গ্রাম প্রধান। এভাবে, তাঁর মর্যাদা বাড়তে বাড়তে তিনি হন 'বজ্রপতি'।

পশুচারণ ভূমি যে কর্মচারীর অধীনে থাকতো তার উপাধি ছিল 'বজ্রপতি'।

সামরিক বাহিনী

রাজার অধীনে কোন স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ছিল না। যুদ্ধের সময়ে রাজা সৈন্যবাহিনী দেখাশুনার দায়িত্ব নিতেন। এই সৈন্যবাহিনী গঠিত হতো বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীদের সমন্বয়ে। এরকম কিছু গোষ্ঠীর উপাধি হচ্ছে 'ব্রত', 'গণ', 'গ্রাম' এবং 'সার্ধ'। মোটামুটিভাবে প্রশাসন ছিল উপজাতীয় চরিত্রের। এখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব ছিল সামরিক বাহিনীর। সাধারণ মানুষ ছিল অনেকটা আধা যাযাবর ধাঁচের। তাই, সম্ভবত ঋগ্‌বেদ যুগের কোন অসামরিক প্রশাসন গড়ে উঠেনি।

'সভা' ও 'সমিতি'

'সভা' ও 'সমিতি' নামে দু'টো পরিষদের কথা জানা যায়। এই পরিষদ রাজাকে পরামর্শ দেয়ার জন্য গড়ে উঠেছিল। পরিষদ দু'টোর নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকায় রাজার পক্ষে স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সুযোগ ছিল না। আর্য রাজাকে মূলত: সেনাপতি মনে করা হতো। তিনি রথে চড়ে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। যুদ্ধের অস্ত্র ছিল বর্শা, কুঠার, তলোয়ার ও তীর-ধনুক।

সার-সংক্ষেপ

ঋগ্‌বেদ যুগে আর্যদের রাজনৈতিক অবস্থার একটি চিত্র পাওয়া যায়। এ যুগে কোন একক রাজ্য গড়ে উঠেনি। সবই ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত। অঞ্চলের প্রধান, রাজা হিসেবে পরিচিত হতেন। রাজা ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে বিভিন্ন উপাধিদারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হতো। এদের সমন্বয়ে একটি প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল। যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল আর্যদের প্রধান পেশা। তাই, এ যুগের প্রশাসন ছিল মূলত: সামরিক প্রশাসন। অসামরিক প্রশাসনের অস্তিত্ব তেমন একটা খুঁজে পাওয়া যায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। আর্যদের ভারগোষ্ঠী অঞ্চলের রাজা ছিলেন–
   ক. সুদাস।
   খ. পুরুকুতসা।
   গ. পুরু।

২। বিশ্বামিত্র ছিলেন–
   ক. একজন বৈদিক রাজা।
   খ. একজন দেবতা।
   গ. একজন আর্য মুনী।

৩। পশুচারণ ভূমির দায়িত্বে ছিলেন–
   ক. বজ্রপতি।
   খ. কুলপ।
   গ. সার্ধ।

৪। রাজার পরামর্শক পরিষদের নাম–
   ক. গণ।
   খ. সভা ও সমিতি।
   গ. সার্ধ।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ঋগ্‌বেদ যুগে রাজার অবস্থান কি ছিল বর্ণনা করুন।
২. ঋগ্‌বেদ যুগের গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারী কারা ছিলেন? লিখুন।
৩. বজ্রপতি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।
৪. ঋগ্‌বেদ যুগের সামরিকবাহিনী কেমন ছিল? লিখুন।

পাঠ ৪

ঋগ্‌বেদ যুগে আর্যদের সামাজিক অবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- আর্যদের সামাজিক কাঠামোর বর্ণনা দিতে পারবেন।
- প্রাথমিক সামাজিক সংগঠন 'পরিবার' সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- সমকালীন সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

সামাজিক কাঠামো

ঋগ্‌বেদ যুগের সামাজিক কাঠামোর মূল কথা হচ্ছে আত্মীয়তার বন্ধন। একজন মানুষ কোন্ গোষ্ঠীর তা বুঝা যেতো তার নামের সাথে যুক্ত উপাধি দেখে। সর্বপ্রথম মানুষ অনুগত থাকত তার গোষ্ঠীর প্রতি। গোষ্ঠীর একটি সাধারণ নাম ছিল। তা হচ্ছে 'জন'। ঋগ্‌বেদে 'জন' শব্দটি অন্তত ২৭৫ বার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু, একবারও 'জনপদ' শব্দটির উল্লেখ নেই। রাজ্য সম্পর্কে তখনও যে কোন ধারণা তৈরি হয়নি এ থেকেই তা অনুমান করা চলে। গোষ্ঠীর আরও একটি নাম আছে। তা হচ্ছে 'বিশ'। অন্ত ত, ১৭০ বার এর উল্লেখ করেছে ঋগ্‌বেদ। ধারণা করা হয় কয়েকটি গ্রাম নিয়ে 'বিশ' গঠিত হতো। সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি ছিল বৈশ্য বর্ণের মানুষ।

শ্রেণী বৈষম্য

আর্যরা যখন ভারতে প্রবেশ করে তখন তাদের সমাজে শ্রেণীভেদ ছিল। ঋগ্‌বেদের প্রথমদিকের শ্লোকে 'ক্ষেত্র' বা 'অভিজাত' এবং উপরে উল্লেখ করা 'বিশ' বা 'সাধারণ মানুষ' এই দুই শ্রেণীর অস্তিত্বের কথা জানা যায়। পাঠ- ১ এ, আপনারা জেনেছেন, আর্যরা ছিল গৌর বর্ণের। তারা এদেশে এসে স্থানীয় কৃষ্ণ বর্ণের মানুষদের কাছাকাছি অনেক সতর্কতার সাথে বসবাস করতে থাকে। কারণ, তাদের ছিল বর্ণের অহঙ্কার এবং তারা রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকতো। এভাবে তারা সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস করতে থাকে। বিজেতা আর্যরা পরাজিত অনার্যদের স্থান দেয় সমাজের এক প্রান্তে। যেসব আর্য অনার্য মহিলাকে বিয়ে করে এবং তাদের জীবন প্রণালী গ্রহণ করে তাদেরও নামিয়ে দেয়া হয় সমাজের নিম্নস্তরে। অন্যদিকে ধর্মীয় যাগযজ্ঞের দায়িত্ব পেয়ে যায় পুরোহিতরা। সবচেয়ে প্রভাবশালী শ্রেণীতে পরিণত হয় এরা। এমনি করে পুরোহিতরা সমাজের উচ্চতম স্থানটি দখল করে নেয়। ঋগ্‌বেদ যুগের শেষ পর্যায়ে এসে আর্য সমাজ চার বর্ণে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বর্ণ বিভক্তিতে ধর্মের অনুমোদন ছিল। বর্ণ চারটি হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। বলা হয়ে থাকে ভগবানের মুখ থেকে সৃষ্টি হয়েছে ব্রাহ্মণ। বাহু থেকে সৃষ্টি হয়েছে ক্ষত্রিয়। উরু থেকে সৃষ্টি হয়েছে বৈশ্য এবং পদযুগল থেকে সৃষ্টি হয়েছে শূদ্র।

পরিবার কাঠামো

বৈদিক যুগে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাথমিক ভিত্তি ছিল 'পরিবার'। কয়েকটি পরিবার নিয়ে গঠিত হতো গ্রাম। পরিবারগুলো ছিল পিতৃতান্ত্রিক। পরিবারের সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি হতেন পরিবার প্রধান। আর্যরা পরিবারকে বলতো 'কুল'। পরিবার প্রধানকে বলা হতো 'কুলপা'। সংসারধর্ম পরিচালনার নেতৃত্ব ছিল মেয়েদের হাতে। মেয়েদের হাতে যথেষ্ট কর্তৃত্ব থাকলেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নিয়ম তাদের মেনে চলতে হতো। ফলে স্বামীর অধীনতা স্ত্রীকে মানতে হতো। বৈদিক সমাজে সাধারণতঃ 'এক বিবাহ' প্রথা প্রচলিত ছিল। বিবাহ বিচ্ছেদ বা বিধবা বিবাহের কথা ঋগ্‌বেদে পাওয়া যায় না।

আনন্দ অনুষ্ঠান

সামাজিক আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এ যুগের সংস্কৃতি ফুটে উঠেছে। সমাজে যারা দৈহিক শক্তিতে বলবান তাদের আমোদ প্রমোদের মধ্যে ছিল রথ প্রতিযোগিতা। এখানে বিভিন্ন পূজা-অর্চনা করা হতো। যুদ্ধ-নৃত্য এবং পশুপাখি শিকার করা হতো। আমোদ প্রমোদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মুষ্টিযুদ্ধ, নৃত্য ও গীত। নারীরা বিশেষতঃ বীণা ও করতালিসহ নাচতো এবং গান গাইতো। ঋগ্‌বেদ যুগে আর্যরা কর্তব্যপরায়ণ ও ন্যায়নীতির প্রতি নিষ্ঠাবান ছিল। ঋগ্‌বেদ থেকে জানা যায়, নিজের ঘরে

খাদ্য মজুদ থাকার পরেও অভাবীকে দান না করা নিন্দার চোখে দেখা হয়েছে। আবার, প্রশংসা করা হয়েছে তাঁর, যিনি ভিক্ষুককে উদার হাতে দান করেন এবং দুর্বলকে শুশ্রূষা করেন। আতিথেয়তার প্রশংসা ছড়িয়ে আছে ঋগ্‌বেদে।

আর্যরা ছিল কর্মঠ এবং যুদ্ধপ্রিয় জাতি। 'সোম' ও 'সুরা' ছিল তাদের পছন্দনীয় পানীয়। যাগযজ্ঞের সময় সোমরস পান করায় ধর্মীয় অনুমোদন ছিল। 'সুরা' ছিল এক ধরনের শক্তিশালী মদ। কিন্তু এই মদ পান করার ব্যাপারে কোন বিধি নিষেধ ছিল না। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দান-ধ্যানের পর আনন্দ উৎসবে ভোজ ও সোমরস পান চলতো। জুয়া খেলা আর্য সমাজের বিনোদনের অংশ ছিল। ঋগ্‌বেদে জুয়া খেলার উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্য-পূর্ব যুগেও ভারতে জুয়া খেলার প্রচলন ছিল।

আর্যরা ছিল কর্মঠ এবং যুদ্ধপ্রিয় জাতি।

সার-সংক্ষেপ

ঋগ্‌বেদ যুগে আর্যদের সামাজিক জীবন ছিল 'পরিবারকেন্দ্রিক'। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে মেয়েদের যথেষ্ট কর্তৃত্ব দেখানোর সুযোগ ছিল। আর্যদের পরিবার কাঠামোর ভিতর থেকে বর্ণবৈষম্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। সমাজ কিছুটা কলুষিতও হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থার ভেতর থেকেও আর্য সমাজে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের বিকাশ ঘটে। নৃত্য, গীত ও অন্যান্য আনন্দ উৎসবে মত্ত থাকতো আর্য সমাজ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। 'জন' শব্দটি ঋগ্‌বেদে উল্লেখ করা হয়েছে–
ক. ২৭৫ বার।
খ. ১৭০ বার।
গ. ১৫০ বার।

২। আর্য সমাজ চার বর্ণে বিভক্ত হয়–
ক. ঋগবেদ যুগের মাঝামাঝি।
খ. ঋগ্‌বেদ যুগের শুরুরদিকে।
গ. ঋগ্‌বেদ যুগের শেষ পর্যায়ে।

৩। বৈদিক যুগে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাথমিক ভিত্তি ছিল–
ক. গ্রাম।
খ. পরিবার।
গ. গোষ্ঠী।

৪। 'কুলপা' বলা হতো–
ক. পরিবার প্রধানকে।
খ. রাষ্ট্র প্রধানকে।
গ. গ্রাম প্রধানকে।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আর্যদের সামাজিক কাঠামো কেমন ছিল বর্ণনা করুন।
২. আর্যদের সমাজে শ্রেণী বৈষম্যের উপর একটি টীকা লিখুন।
৩. আর্যদের পরিবার সম্পর্কে ধারণা দিন।

পাঠ ৫

ঋগ্‌বেদ যুগের আর্যদের ধর্মীয় অবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- ঋগ্‌বেদ যুগের দেবতাদের কথা বর্ণনা করতে পারবেন।
- দেবতাদের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম করা হতো সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যাগ-যজ্ঞসমূহের বর্ণনা দিতে পারবেন।

আর্য ধর্মের উৎস ঃ বিভিন্ন দেব-দেবীর পরিচয়

ঋগ্‌বেদে আর্যদের প্রতিদিনের জীবন ও রীতিনীতি নিয়ে অনেক কথা লেখা হয়েছে। তা থেকে তাদের ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে ধারণা করা যায়। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পুলকিত ও আবেগাপ্লুত হয়েছেন আর্য ঋষিগণ। এভাবে তাদের মনে জেগেছে সৃষ্টি ও স্রষ্টার প্রতি ভক্তি। প্রকৃতির ভিতর থেকে তাই আর্যরা তাদের দেব-দেবী খুঁজে নিয়েছেন। প্রথমদিকে আর্যদের দেব-দেবী ছিল আকাশ এবং আকাশের সাথে সম্পর্ক আছে এমন সব বিষয়। মনে করা হতো আকাশ দেবতা পুরুষ সত্তা। দেবীদের মধ্যে পৃথ্বি,অদিতি, ঊষা, রাত্রি এবং অরণ্যানী। তবে, প্রধান দেবতা হিসেবে পুরুষ দেবতাকেই পূজা করা হতো। আর্য ধারণা মতে, তিনটি অঞ্চলে দেবতারা বিচরণ করতেন। মিত্র ও বরুন দেবতা ছিলেন আকাশচারী। মধ্য আকাশের দেবতা হলেন ইন্দ্র ও মরুৎ এবং পৃথিবীর দেবতা হলেন অগ্নি ও সোম।

গুরুত্বের বিচারে দেবতাদের স্থান

গুরুত্বের দিক থেকে দেবতাদের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছিল। এ যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেবতা ছিলেন ইন্দ্র। ইন্দ্রকে বলা হতো পুরন্দর। এর অর্থ দুর্গ ধ্বংসকারী। বিশ্বাস মতে, ইন্দ্র দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় আর্যদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং তাদের জয়ী করেছিলেন। ঋগ্‌বেদে প্রায় ২৫০ টি শ্লোক ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিল। ইন্দ্র ছিলেন বৃষ্টির দেবতা। বৈদিক যুগে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দেবতা হলেন অগ্নি। তাঁর উদ্দেশ্যে ২০০ টি শ্লোক নিবেদিত হয়েছে। অগ্নি স্বর্গের দেবতা। তিনি পৃথিবীর মানুষের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করতেন। বিশ্বাস মতে, অগ্নির উদ্দেশ্যে যা উৎসর্গ করা হতো তা ধোঁয়ার আকারে কুন্ডলী পাকিয়ে আকাশের দেবতার কাছে পৌঁছুতো। বরুণ ছিলেন তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ দেবতা। তিনি ছিলেন পানির দেবতা। বরুণের কাজ ছিল পৃথিবীর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। বরুণের ইচ্ছাতেই পৃথিবীর সব ঘটনা ঘটতো। সোম ছিলেন উদ্ভিদ কুলের দেবতা। আপনারা পূর্বেই সোমরসের কথা জেনেছেন। ঋগ্‌বেদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী গাছ গাছালি থেকে এই সোমরস তৈরি করা হতো। এরপরে দেবতা মারুতের অবস্থান। তিনি ছিলেন ঝড়-ঝঞ্ঝা দেবতা। এভাবেই ঋগ্‌বেদে আমরা অসংখ্য দেবতার সন্ধান পাই; যাঁরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রতিনিধি স্বরূপ ছিলেন।

শুরুতে আপনারা দেবীদের কথা জেনেছেন। এদের মধ্যে ঊষা বা অদিতিকে মনে করা হতো ভোরের দেবতা। কিন্তু ঋগ্‌বেদে দেবীদের কথা তেমন গুরুত্ব দিয়ে আলোচিত হয়নি। আর্য সমাজ পিতৃতান্ত্রিক হওয়ায় পুরুষ দেবতারা মহিলা দেবতাদের তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন।

পূজার বিভিন্ন পদ্ধতি

ঋগ্‌বেদে আর্যদের ধর্মজীবনে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। দেবতাদের মনোরঞ্জনের জন্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্ম করা হতো। এ যুগে মানুষের প্রধান কর্তব্য ছিল দেবতাদের পূজা করা। তাই পূজা মানেই ছিল দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে আহুতি দান ও ঋগ্‌বেদে লেখা শ্লোকগুলো আবৃত্তি করা। দেবতাদের নিকট প্রেরণের উদ্দেশ্যে সাধারণ খাদ্য, পানীয় অথবা ঘোড়া, ভেড়া, মহিষ, ষাঁড় ও গরু অগ্নিতে আহুতি দেয়া হতো। দেবতাদের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশায় এ সমস্ত উৎসর্গ করা হতো। এভাবে, দেবতা ও মানুষের মধ্যে দেয়া-নেয়ার একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এছাড়াও দেবতাদের করুণা লাভের পর তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ছিল যজ্ঞের উদ্দেশ্য। আর্যরা মূর্তি পূজা দ্রাবিড়দের কাছ থেকেই শিখেছে। মূলত জাগতিক জীবনের সুখের জন্যই তারা পূজা করতো। যেমন- তাদের প্রার্থনা ছিল সন্তান লাভ, গো-ধন বা গরু পাওয়া অথবা শত্রু নিধন করা।

পূজা মানেই ছিল দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে আহুতি দান ও ঋগ্‌বেদে লেখা শ্লোকগুলো আবৃত্তি করা

যাগ-যজ্ঞের শ্রেণী বিভাগ

ঋগ্‌বেদ যুগে অনুষ্ঠিত যজ্ঞগুলিকে দু'টো শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

(ক) ঋগ্‌বেদে কতগুলো শ্লোক প্রার্থনার জন্য ব্যবহৃত হতো। এগুলোর মধ্য দিয়ে জন্ম, বিয়ে, মৃতের সৎকার, পিতৃ পূজা, গবাদি পশুর বংশবৃদ্ধি এবং অধিক ফসলের কামনা করা হতো। এ ধরণের অনুষ্ঠানকে বলা হতো 'গৃহকর্মাণি'। এসময় গৃহে রাখা আগুনে বিভিন্ন দ্রব্য আহুতি দেয়া হতো। ধনী-দরিদ্র সমস্ত গৃহস্থরাই এই যজ্ঞ পালন করতো।

(খ) বিশাল আয়োজনে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হতো। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করা, রোগ নিবারণ বা নিরাময় করা এবং হিংস্র পশুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া। সাধারণতঃ রাজা বা ধনী ব্যক্তিরা এ ধরণের যজ্ঞের আয়োজন করতেন। এই যজ্ঞকে বলা হতো 'শ্রৌত যজ্ঞ'। এই যজ্ঞের আয়োজনও ছিল বিশাল। পৃথক পৃথক তিনটি বেদীতে আগুন জ্বালানো হতো। ক্রিয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন বহু সংখ্যক পুরোহিত। গাওয়া হতো ঋগ্‌বেদের অনেক শ্লোক। ঋগ্‌বেদ থেকে জানা যায় প্রথম দিকে মৃতদেহ কবর দেয়ার প্রথা ছিল। পরে কবর ও দাহ উভয় পদ্ধতির প্রচলন হয়। এভাবেই ভারতে মৃতদেহ পোড়ানোর রীতি চালু হয়েছিল।

সার-সংক্ষেপ

ঋগ্‌বেদ অনুযায়ী বহু দেবতায় বিশ্বাস ছিল আর্যদের। প্রাকৃতিক বিভিন্ন বিষয়ের মধ্য থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে দেবতাদের। দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য যে সমস্ত আচার আচরণের আয়োজন করা হয়েছিল তার ভিতর থেকেই ঋগ্‌বেদ যুগের ধর্মের একটি কাঠামো তৈরি হয়। এ যুগের ধর্মে পূজা হিসেবে যাগ যজ্ঞের বিশাল আয়োজন ছিল। আর্যদের এই ধর্মবোধই পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মকে নির্দিষ্ট রূপ দিতে পেরেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। আর্য মতে, পৃথিবীর দেবতার নাম–
   ক. ইন্দ্র।
   খ. পৃথ্বি।
   গ. অগ্নি।

২। ঋগ্‌বেদে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিল-
   ক. ২৫০ টি শ্লোক।
   খ. ২০০ টি শ্লোক।
   গ. ১০০ টি শ্লোক।

৩। আর্যরা মূর্তির পূজা শিখেছে-
   ক. ঋগ্‌বেদ থেকে।
   খ. দেবতাদের কাছ থেকে।
   গ. দ্রাবিড়দের কাছ থেকে।

৪। 'শ্রৌত' যজ্ঞের আয়োজন করা হতো-
   ক. হিংস্র পশুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।
   খ. মৃতের সৎকারের জন্য।
   গ. গবাদি পশুর বংশ বৃদ্ধির জন্য।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ঋগ্‌বেদ যুগের দেবতাদের পরিচয় দিন।
২. ঋগ্‌বেদ যুগের পূজার বিভিন্ন পদ্ধতির বিবরণ দিন।
৩. ঋগ্‌বেদ যুগের বিভিন্ন যাগ-যজ্ঞসমূহের বর্ণনা দিন।

পাঠ ৬

ঋগ্‌বেদ যুগের আর্যদের অর্থনৈতিক অবস্থা।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- ঋগ্‌বৈদিক যুগের অর্থনীতিতে পশু সম্পদের ভূমিকা কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ঋগবৈদিক যুগের অর্থনীতিতে কৃষিব্যবস্থার ভূমিকা কেমন ছিল তার বিবরণ দিতে পারবেন।

আয়ের মূল উৎস পশু-পালন ঃ প্রধান অর্থকরী সম্পদ 'গরু'

আপনারা আগেই জেনেছেন, আর্যরা শহর গড়েনি। তারা গ্রামীণ সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। নগর না গড়ার কারণে নির্দিষ্ট কোন অর্থনৈতিক কাঠামো তারা সৃষ্টি করতে পারেনি। আর্য অর্থনীতিতে পশুপালন ও কৃষি দুইয়েরই ভূমিকা ছিল। তবে, আয়ের মূল উৎস ছিল পশুপালন। ধীরে ধীরে আর্য সমাজে গরু সবচেয়ে মূল্যবান পশুতে পরিণত হয়। ঋগ্‌বেদে অসংখ্যবার গরু শব্দটির উল্লেখ আছে। কৃষির প্রয়োজনে গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি কৃষক সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশা করতো। যোদ্ধাদের সবচেয়ে বেশি লোভনীয় জিনিস ছিল পরাজিতের কাছ থেকে গরু লুট করা। গরুকে কেন্দ্র করেই এদের অধিকাংশ যুদ্ধ বাঁধতো। ঋগ্‌বেদে যুদ্ধ শব্দটি না ব্যবহার করে তার বদলে ব্যবহার করতো 'গাভিস্থি' শব্দটি। গাভিস্থি শব্দের অর্থ গো-অন্বেষণ। এসব কারণে মনে করা হয়, বৈদিক যুগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ছিল গরু। পুরোহিতরাও পূজা অর্চনা করে নজরানা পেতো গরু। প্রাচীনকালে 'গো-ধন' বলে একটি কথার প্রচলন ছিল। 'ধন' অর্থাৎ অর্থ-কড়ি বা টাকা-পয়সা হিসেবে গরুকে বিবেচনা করা হতো। তাই, বলা হয়ে থাকে মুদ্রা প্রচলনের পূর্বে গরুই ছিল বিনিময়ের মাধ্যম। যদিও আর্য সমাজে গরু অর্থকরী সম্পদ ছিল কিন্তু ধর্মের দৃষ্টিতে গরুকে পবিত্র বা দেবতাজ্ঞান করা হতো না। কৃষিকাজ ছাড়াও আর্যরা খাদ্যের প্রয়োজনে ষাঁড় বা গাভী হত্যা করতো। সাধারণত: বিশেষ অনুষ্ঠানেই আর্যরা মাংস খেতে পারতো। গরুর অর্থনৈতিক মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে গরুর প্রতি ভক্তিও বাড়তে থাকে। গো-সম্পদ রক্ষা করার প্রয়োজনও অনুভব করে মানুষ। এভাবে, পরবর্তীকালে হিন্দু সমাজে গরুকে পবিত্র জ্ঞান করে পূজা করার রীতি চালু হয়।

আর্য সমাজে গরু অর্থকরী সম্পদ ছিল কিন্তু ধর্মের দৃষ্টিতে গরুকে পবিত্র বা দেবতাজ্ঞান করা হতো না

গরু যেমন কৃষি অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, যুদ্ধের প্রয়োজনে ঘোড়ার ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আর্যদের ঘোড়াটানা রথ দেখলে সিন্ধু উপত্যকার মানুষেরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তো। ঋগ্‌বেদের শ্লোকে ঘোড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। ছাগল ও ভেড়া ছিল আর্যদের গৃহপালিত পশু।

ক্ষুদ্র শিল্প

ঋগ্‌বৈদিক যুগের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র শিল্পের কিছু ভূমিকা ছিল। ঋগ্‌বেদে ছুতোর, রথ নির্মাতা, তাঁতী, চর্মশিল্পী, মৃৎশিল্পী ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগরের উল্লেখ আছে। এ থেকে মনে করা হয় এ যুগের অধিবাসীরা এই সব শিল্পে অভ্যস্ত ছিলেন। ঋগ্‌বেদ থেকে জানা যায় এ যুগের মানুষ তামা ও ব্রোঞ্জের ধাতু ব্যবহার করতে জানতো। তবে ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। আর্যদের বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জানা যায়। এসময় ভেড়ার পশম দিয়ে কাপড় তৈরি হতো। বৈদিক আর্যরা সেলাই কর্মে পটু ছিল। আর্যদের পোশাক সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যায় ঋগ্‌বেদে। এখানে বলা হয়েছে তারা তিনটি বস্ত্র পরিধান করতো- (ক) নীবি (কাটিবাস) (খ) পরিধান (পরিধেয় বস্ত্র) ও (গ) অধিবাস বা উত্তরীয়। পশমের পাশাপাশি কার্পাস ও রেশমের ব্যবহার জানতো আর্যরা। এ যুগে পরিচ্ছদ হিসেবে পশুর চামড়াও প্রচলিত ছিল।

মৃৎপাত্র

পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মাটি খনন করে বেশ কিছু ধূসর বর্ণের মাটির পাত্র পেয়েছেন। সময়ের বিচারে এগুলো ঋগ্‌বৈদিক যুগের। ঋগ্‌বেদে যে সমস্ত অঞ্চলের উল্লেখ আছে মৃৎপাত্রসমূহ সে অঞ্চলের ভেতরেই পাওয়া গিয়েছে। এসব থেকে ধারণা করা হয় বৈদিক যুগে মৃৎশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল।

কৃষি ব্যবস্থা

ভারতীয় আর্য সমাজে কৃষির ব্যাপক উন্নয়ণ ঘটেছিল। ঋগ্‌বেদের প্রথমদিকে লাঙ্গলের ফলার কথা উল্লেখ আছে। মনে করা হয় এ লাঙ্গলের ফলা কাঠের তৈরি ছিল। চাষবাস করা, শস্য বোনা, সেচ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রভৃতির কথা প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। কৃষির সাথে সম্পর্ক ছিল বলেই এ সময়ে আর্যদের ঋতু সম্পর্কে ভাল ধারণা ছিল। কৃষিক্ষেত্রে গরুর ভূমিকার কথা আপনারা আগেই জেনেছেন। ঋগ্‌বেদে সাধু-সন্ন্যাসীকে ভূমিদান করার কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। মনে করা হয়, এ যুগে আর্যরা কোন কোন ক্ষেত্রে খন্ড খন্ড জমির মালিক ছিল। অবশ্য জমি গরুর মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে মনে করা হতো না।

সার-সংক্ষেপ

ঋগ্‌বৈদিক যুগে আর্যদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না। যেটুকু জানা গিয়েছে তাতে বোঝা যায়, কৃষি ও পশুপালন ছিল তাদের প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। গরু ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। যুদ্ধের প্রয়োজনে ঘোড়ার গুরুত্বও লক্ষ করা যায়। অর্থনীতির সহায়ক শক্তি হিসেবে বেশ কিছু ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার কথা জানা যায়। যেহেতু এ যুগের আর্যরা গ্রামীণ সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল তাই কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে উঠাই ছিল স্বাভাবিক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ণ : ৪.৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। আর্য সমাজে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ছিল–
ক. গরু।
খ. ঘোড়া।
গ. বস্ত্রশিল্প।

২। ঋগ্‌বেদে 'গাভিস্থি' শব্দটি ব্যবহার করা হতো–
ক. গরুর বদলে।
খ. পশুর বদলে।
গ. যুদ্ধের বদলে।

৩। পাঞ্জাবে পাওয়া ঋগ্‌বৈদিক যুগের মাটির পাত্রের রং ছিল–
ক. কালো।
খ. লাল-কালো।
গ. ধূসর।

৪। ঋগ্‌বৈদিক যুগে লাঙ্গলের ফলা ছিল–
ক. পাথরে তৈরি।
খ. কাঠের তৈরি।
গ. লোহার তৈরি।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ঋগ্‌বৈদিক যুগে প্রধান অর্থকারী সম্পদ হিসেবে গরুর অবস্থান ব্যাখ্যা করুন।
২. ঋগ্‌বেদ যুগের ক্ষুদ্র শিল্পের উপর টীকা লিখুন।

পাঠ ৭

ঋগ্‌বেদ পরবর্তী আর্যদের রাজনৈতিক অবস্থা।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- কিভাবে ক্ষুদ্র জন সংগঠনের বদলে বড় রাজ্য গড়ে উঠলো তা জানতে পারবেন।
- রাজার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিভাবে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- রাজকার্য পরিচালনার ব্যাপারে যা জানা যায় সে সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

রাজনৈতিক জীবন : ছোট ছোট রাজ্যের উদ্ভব

ঋগ্‌বৈদিক যুগের পর আর্যরা ধীরে ধীরে গঙ্গা নদীর অববাহিকা অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়। এখানে আর্য সংস্কৃতির সাথে স্থানীয় সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটে। এ যুগ সম্বন্ধে যে সমস্ত সূত্র থেকে জানা যায় সেগুলো হচ্ছে - প্রথমত:, পরবর্তীকালে রচিত বৈদিক সাহিত্য, উপনিষদ, সূত্র ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত:, হস্তিনাপুর, অহিচ্ছত্র ও কৌশাম্বী শহরে পাওয়া বিভিন্ন জিনিসপত্র থেকে ঋগ্‌বেদ পরবর্তী সভ্যতার রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে ধারণা নেয়া যায়। আপনারা দেখেছেন, ঋগ্‌বৈদিক যুগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন সংগঠনগুলো গড়ে উঠেছিল। এখন এই জাতীয় সংগঠনের গুরুত্ব কমে আসে। তার জায়গায় রাজার সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ঋগ্‌বৈদিক যুগের 'সভা' ও 'সমিতি' এ যুগে টিকে থাকলেও তার ক্ষমতা পাল্টে গেল। সভা-সমিতির তত্ত্বাবধান ধনী ও রাজপুত্রদের ভাল লাগলো না। সভার অধিবেশনে এ যুগে মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হলো। সভা-সমিতির কর্তা ব্যক্তি হলেন এ যুগে অভিজাত এবং ব্রাহ্মণরা। পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্য গোষ্ঠীগুলো ছোট ছোট রাজ্য গড়ে তুলতে থাকে। এদের মধ্যে যারা শক্তিশালী তারা নতুন নতুন অঞ্চল জয় করে রাজ্যসীমা বাড়াতে থাকে। রাজনৈতিক ঐক্যের প্রয়োজনে কখনও কখনও তাঁরা ধর্মের সহযোগিতা নিতে থাকে। এ কারণে আয়োজন করা হতে থাকে নানা রকম যাগ যজ্ঞের। রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজার শক্তি বেড়ে যায়। উপজাতীয় কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ হয়ে রইল ছোট ছোট অঞ্চলে। গোষ্ঠীগুলোর শাসক ছিলেন রাজা। এ যুগে প্রভাবশালী গোষ্ঠীর নামে তাদের অধিকৃত অঞ্চলের নামকরণ করা হতো। যেমন- 'পঞ্চাল' প্রথমে ছিল একটি গোষ্ঠীর নাম পরে পঞ্চাল হলো একটি অঞ্চলের নাম। রাষ্ট্র শব্দটি এ যুগেই প্রথম শোনা গিয়েছিল।

বিভিন্ন প্রকার যাগযজ্ঞের আয়োজন

আগেই বলা হয়েছে, রাজার ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। এরকম রাজার একটি অনুষ্ঠান ছিল 'রাজসূয় যজ্ঞ'। বলা হতো এ যজ্ঞের মাধ্যমে রাজা সর্বক্ষমতা লাভ করলেন। আরেকটি বহুল প্রচলিত যজ্ঞ ছিল 'অশ্বমেধ যজ্ঞ'। এই যজ্ঞের উদ্দেশ্য ছিল রাজার ক্ষমতা প্রসারিত করা। 'বাজপেয়' বলে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন রাজা। এই রথের দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন রাজা এবং এই প্রতিযোগিতায় রাজাকে অবশ্যই জয়ী বানানো হতো। এ সমস্ত অনুষ্ঠানের ভেতর থেকে রাজার প্রতি ধীরে ধীরে মানুষের আস্থা ও সম্মান বৃদ্ধি পায়।

বিভিন্ন কর্মকর্তা নিয়োগ

পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজ কোষাগারে রাজস্ব উপঢৌকন সংগ্রহ করা হতো। একজন রাজকর্মচারী কোষাগারের তত্ত্বাবধান করতেন। মহাকাব্যগুলোর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বড় বড় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সময় রাজা ও রাজপুত্ররা মুক্ত হাতে দান করতেন। সব শ্রেণীর মানুষকে তারা নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। রাজার কাজে সহায়তা করতেন রাজপুত্ররা। এছাড়াও তাঁর সাহায্যের জন্য ছিলেন রাজ পুরোহিত, সেনাপতি, বড় রাণী ও অন্যান্য কতিপয় রাজ কর্মচারী। স্থানীয় পর্যায়ে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার ভার ছিল গ্রামণী ও সভা-সমিতিগুলোর উপর। এসব নিয়ন্ত্রণ করতেন প্রভাবশালী গোষ্ঠীপতিরা। সভা-সমিতিগুলো স্থানীয়ভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করতো। পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজার কোন স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ছিল না। উপজাতীয় বাহিনীগুলোকে যুদ্ধের সময় সংঘবদ্ধ করা হতো।

রাজার কাজে সহায়তা করতেন রাজপুত্ররা, রাজপুরোহিত, সেনাপতি, বড়রাণী ও রাজ কর্মচারিগন

সার-সংক্ষেপ

ঋগ্‌বেদ পরবর্তী আর্যদের রাজনৈতিক অবস্থা জানার জন্যে পরবর্তীকালে রচিত সাহিত্যসমূহের উপর নির্ভর করতে হয়। সামান্য যা সূত্র পাওয়া গিয়েছে তা থেকে বুঝা যায় এ যুগে আর্যরা ক্ষুদ্র জন সংগঠনের বদলে অপেক্ষাকৃত বড় অঞ্চলে রাজ্য গড়ে তুলেছিল। বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে রাজার প্রতি মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধা বাড়ানোর চেষ্টা করা হতো। রাজকার্য পরিচালনায় রাজাকে সহযোগিতা করার জন্য বেশ কিছু কর্মচারী নিয়োগের কথাও জানতে পারা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.৭

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। পরবর্তী বৈদিক যুগে পঞ্চাল ছিল–
ক. একজন রাজার নাম।
খ. একটি ধর্মের নাম।
গ. একটি গোষ্ঠীর নাম।

২। 'রাজসূয় যজ্ঞ' ছিল–
ক. আচার অনুষ্ঠানের নাম।
খ. একটি প্রতিযোগিতার নাম।
গ. একটি ধর্মের নাম।

৩। পরবর্তী বৈদিক যুগে রথের দৌড় প্রতিযোগিতাকে বলা হতো–
ক. রাজসূয় যজ্ঞ।
খ. অশ্বমেধ যজ্ঞ।
গ. বাজপেয়।

৪। পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজার–
ক. কোন সৈন্যবাহিনী ছিল না।
খ. স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ছিল।
গ. স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ছিল না।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ঋগ্‌বেদ পরবর্তীকালে রাজার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কি কি আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো তা আলোচনা করুন।

২. ঋগ্‌বেদ পরবর্তী আর্যদের রাজকার্য পরিচালনা সম্পর্কে ধারণা দিন।

পাঠ ৮

ঋগ্‌বেদ পরবর্তী আর্যদের সামাজিক অবস্থা।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- ঋগ্‌বেদ পরবর্তী আর্য সমাজে বর্ণপ্রথার অবস্থান কেমন ছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- ঋগ্‌বেদ পরবর্তী আর্য সমাজে মেয়েদের অবস্থা কেমন ছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ঋগ্‌বেদ পরবর্তী আর্য সমাজের 'গোত্র' ও 'আশ্রম' প্রথা সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন।

বর্ণ প্রথা ঃ চার বর্ণের মানুষদের অবস্থান

ঋগ্‌বেদ পরবর্তী আর্য সমাজের গঠনে আসে পরিবর্তন। ঋগ্‌বেদ যুগে বর্ণপ্রথা সমাজে খুব অল্পই দেখা গিয়েছে বলে আপনারা জেনেছেন। সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে বর্ণভেদ প্রথা স্পষ্ট হতে থাকে। বংশানুক্রমিক পেশাজীবী সম্প্রদায়গুলোর উত্থান ঘটে। পুরোহিত এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবিকা এ সময় বংশগত হয়ে পড়ে। জীবিকার ভিত্তিতে বৈশ্য ও শূদ্ররাও বিভক্ত হতে থাকে। এ যুগের সমাজের মানুষ চারটি বর্ণে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এগুলো হচ্ছে - ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এ যুগের সমাজে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আর ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব ব্রাহ্মণের হাতে থাকায় এ যুগের ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা প্রচুর বৃদ্ধি পায়। আর্য সমাজের প্রথমদিকে ধর্ম পরিচালনা করতে পারে এমন যাজক শ্রেণীর সংখ্যা ছিল ষোলটি। ধীরে ধীরে বাকি পনেরটি যাজক শ্রেণীকে পিছনে ফেলে রেখে ধর্ম পরিচালনার প্রধান পুরোহিত হয়ে পড়ে ব্রাহ্মণরা। কৃষিকাজ সংক্রান্ত উৎসব অনুষ্ঠানে প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করতেন ব্রাহ্মণ। রাজা যাতে যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন তার জন্য ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করতেন। বিনিময়ে রাজাকে একটি অঙ্গীকার করতে হতো যে, তিনি ব্রাহ্মণদের কোনরকম ক্ষতি করবেন না। আর্য সমাজে চার বর্ণের যে বিভাজন আসে তাতে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্যদের ভূমিকার ব্যাপারটিও স্পষ্টভাবে দেখা যায় পরবর্তী বৈদিক যুগের সমাজে। এ যুগে ক্ষত্রিয়রা রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব লাভ করতেন। বৈশ্যরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। পরবর্তী বৈদিক যুগে বৈশ্যরাই ছিল একমাত্র শ্রেণী যাদের রাজস্ব দিতে হতো এবং এই রাজস্বের উপর নির্ভরশীল ছিলেন ক্ষত্রিয়রা। ক্ষত্রিয়দের কাছে বৈশ্যরা যাতে পদানত থাকে সেজন্য এই যুগে কয়েকটি আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। উল্লিখিত তিনটি উচ্চ বর্ণের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। এই তিন বর্ণের মানুষেরা উপনয়ন বা পৈতা পড়তে পারতেন। এ অধিকার শূদ্রদের ছিল না। তবে, একথা মানতে হবে যে পরবর্তী বৈদিক যুগের সমাজে বর্ণভেদ প্রথা তেমন সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করতে পারেনি। তাই, বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে তখনও বিয়ে শাদী প্রথা চালু ছিল। কোথাও কোথাও কোন ক্ষত্রিয় এ যুগে ব্রাহ্মণের বদলে যাগ-যজ্ঞ পরিচালনা করতেন এবং বেদ পাঠ করতেন। তবে, সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে শূদ্রের তেমন কোন মর্যাদার আসন ছিল না। শুদ্র সম্বন্ধে বক্তব্য পাওয়া যায় 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে। সেখানে বলা হয়েছে শূদ্র অন্যের দাস, যখন ইচ্ছা তাকে তাড়িয়ে দেয়া যায় বা হত্যা করা যায়। ধীরে ধীরে বর্ণগুলো বিভিন্ন বংশে চিহ্নিত হয়ে পড়ে। আর তার ফলাফল হিসাবে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। বেদ পাঠ এবং ধর্ম কর্মে পুরোহিতের ভূমিকা পালন করেন ব্রাহ্মণরা। 'সূত্র' গ্রন্থগুলোতে বর্ণভেদ প্রথার বিবর্তনের মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। 'মনুসংহিতা'-য় উল্লেখ করা হয়েছে- কিভাবে ব্রাহ্মণদের উত্থান ঘটে এবং বর্ণপ্রথার কঠোরতা আরোপিত হয়। শূদ্রদের গৃহস্থালি কাজে অংশ গ্রহণের স্বীকৃতি ছিল। সময়ের সাথে সাথে আর্য সমাজে শূদ্রদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। অন্য বর্ণের লোকেরা তাদের ছুঁলে অপবিত্র হবে এমন বিধানও জারি করা হয়। অর্থাৎ সমাজ বিধান অনুযায়ী উচ্চবর্ণের মানুষেরা ছিল 'পবিত্র'। অপবিত্র শূদ্রদের ছায়া মাড়ালে জাত যাবে তাদের। এর ফলে ছোঁয়াছুঁয়ির দোষ সমাজকে কলুষিত করে।

এ যুগের সমাজের মানুষ চারটি বর্ণে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এগুলো হচ্ছে - ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র

ক্ষত্রিয়রা রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব লাভ করতেন। বৈশ্যরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন

সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে শূদ্রের তেমন কোন মর্যাদার আসন ছিল না

বেদ পাঠ এবং ধর্ম কর্মে পুরোহিতের ভূমিকা পালন করেন ব্রাহ্মণরা

সমাজে মেয়েদের অবস্থান

ঋগ্‌বেদ পরবর্তী যুগের আর্য সমাজে মেয়েদের তেমন মর্যাদা দেয়া হতো না। কন্যা সন্তান জন্ম হওয়াকে অভিশাপ মনে করা হতো। এই সময়ের অন্যতম বিধানকর্তা ছিলেন ধর্মশাস্ত্রের পণ্ডিত 'মনু'। তাঁর মতে, নারীকে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে দেয়া অনুচিত। বাল্যকালে মেয়েদের পালন করবে পিতা, যৌবনে স্বামী, আর বুড়ো বয়সে পুত্র। তবে এই যুগেও নারীদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ছিল। কেউ কেউ শিক্ষা ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এ যুগের শাস্ত্র চর্চায়

ধর্মশাস্ত্রের পণ্ডিত 'মনু'। তাঁর মতে, নারীকে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে দেয়া অনুচিত

এ যুগে রাজা ও ধনী শ্রেণীর পুরুষেরা বহু বিবাহ করতে পারতেন

খ্যাতিলাভ করেছিলেন গার্গী ও মৈত্রেয়ী নামের দুই মহিলা। এ যুগে রাজা ও ধনী শ্রেণীর পুরুষেরা বহু বিবাহ করতে পারতেন। সমাজে একদিকে বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল; অন্যদিকে, নিষিদ্ধ ছিল বিধবা বিবাহ। নারীরা উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি লাভ করতে পারতেন না।

গোত্র ও আশ্রম প্রথা

বৈদিক সাহিত্যে চারটি আশ্রমের উল্লেখ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ব্রহ্মচারী (ছাত্র), গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস

পরবর্তী ঋগ্‌বেদ যুগে গোত্র প্রথার উদ্ভব ঘটেছিল। আক্ষরিক অর্থে 'গোত্র' শব্দের অর্থ ছিল গরুর খোয়াড়। কিন্তু, পরবর্তীকালে গোত্র বলতে একই পূর্ব-পুরুষের উত্তরাধিকারীদের চিহ্নিত করা হতে থাকে। এক গোত্র থেকে অন্য গোত্রে যাওয়ার তেমন বাঁধা ছিল না। তবে, একই গোত্রের দু'জনের মধ্যে বিয়ে ছিল নিষিদ্ধ। ঋগ্‌বৈদিক যুগে আশ্রম প্রথা সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায়নি। কিন্তু, পরবর্তী বৈদিক যুগে আমরা আশ্রম প্রথা সম্বন্ধে ধারণা পাই। বৈদিক সাহিত্যে চারটি আশ্রমের উল্লেখ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ব্রহ্মচারী (ছাত্র), গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস।

পরবর্তী বৈদিক যুগের মানুষের পোশাক এবং খাদ্য সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্যে। জানা যায়, এ যুগের তুলা ও পশমী বস্ত্র আর্যদের পোশাক ছিল। নারী-পুরুষ উভয়েই অলঙ্কার ব্যবহার করতো। অলঙ্কার প্রধানত: স্বর্ণ দিয়ে তৈরি করা হতো। এ যুগে আর্যদের খাদ্য তালিকায় ছিল দুধের ননী, শাক-সব্জি, ফল ও মাংস ইত্যাদি।

সার-সংক্ষেপ

ঋগ্‌বেদ-পরবর্তী আর্যদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সে যুগের সাহিত্য থেকে ধারণা লাভ করা যায়। এ সময়ে আর্য সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল বর্ণ প্রথার অবস্থান। চার বর্ণে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল সমাজ। পেশার বিচারে এভাবে সমাজকে বিভক্ত করা হয়েছিল। অন্যদিকে, পিতৃতান্ত্রিক আর্য সমাজে নারীর অবস্থান নিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। সমাজে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান বৃদ্ধি পেতে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.৮

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। আর্য সমাজের প্রথম দিকে ধর্ম পরিচালনা করতে পারতো–
   ক. ৪ টি যাজক শ্রেণী।
   খ. ১৫ টি যাজক শ্রেণী।
   গ. ১৬ টি যাজক শ্রেণী।

২। পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজাকে রাজস্ব দিতে হতো–
   ক. ক্ষত্রিয়দের।
   খ. বৈশ্যদের।
   গ. শূদ্রদের।

৩। শূদ্রদের সম্বন্ধে প্রথম ধারণা পাওয়া যায়–
   ক. 'সূত্র' গ্রন্থে।
   খ. মনুসংহিতায়।
   গ. ঐতরেয় ব্রাহ্মণে।

৪। বৈদিক সাহিত্যে 'বাণপ্রস্থ' বলতে বোঝায়–
   ক. একটি ধর্মগ্রন্থ।
   খ. একটি আশ্রম।
   গ. একটি কাব্যগ্রন্থ।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ঋগ্‌বেদ পরবর্তী আর্য সমাজের বর্ণ প্রথা সম্বন্ধে ধারণা দিন।
২. আর্য সামাজে মেয়েদের অবস্থা কেমন ছিল বর্ণনা করুন।
৩. ঋগ্‌বেদ যুগের গোত্র ও আশ্রম প্রথা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

পাঠ ৯

ঋগ্‌বেদ পরবর্তী আর্যদের ধর্মীয় অবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- পরবর্তী বৈদিক যুগের দেবতাদের কথা বলতে পারবেন।
- পরবর্তী বৈদিক যুগের ধর্মে যে সমস্ত যাগযজ্ঞ পালন করা হতো তার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- পরবর্তী বৈদিক যুগের আশ্রম প্রথা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

পরবর্তী বৈদিক যুগের গুরুত্বপূর্ণ দেবতা

পরবর্তী বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণদের প্রভাবে বৈদিক সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় উচ্চ দোয়াব অঞ্চল। এ সময়ে প্রচুর আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় আচরণবিধি লক্ষ করা যায়। সেই সাথে নতুন নতুন দেবতাদের ধারণাও প্রকাশ পেতে থাকে। ঋগ-বৈদিক যুগে আপনারা দু'জন প্রধান দেবতার কথা জেনেছেন। পরবর্তী বৈদিক যুগে এসে 'ইন্দ্র' ও 'অগ্নি' এই দুই গুরুত্বপূর্ণ দেবতা তাঁদের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেন। এ যুগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেবতা হন 'প্রজাপতি'। একই সাথে ঋগ্‌বেদ যুগের কম গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় দেবতা সামনের সারিতে এসে দাঁড়ান। যেমন- পশুরাজ 'রুদ্র' পরবর্তী বৈদিক যুগে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছিলেন। বিষ্ণু ছিলেন সাধারণ মানুষের রক্ষাকর্তা। এ যুগে মূর্তি পূজার গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পায়। চার বর্ণে বিভক্ত সমাজে প্রতি বর্ণের নিজস্ব দেবতা ছিল বলে অনুমান করা হয়। পশুপালক দেবতা 'পূষণ' ছিলেন এ যুগে শূদ্রদের দেবতা।

'গৃহ্য' ও 'শ্রৌত' যজ্ঞ

যজ্ঞে সকাল ও সন্ধ্যায়, পূর্ণিমা-অমাবস্যায় আহুতি দান ছিল গৃহস্থের প্রতিদিনের কাজ

পরবর্তী বৈদিক যুগে আচার অনুষ্ঠান ও যাগযজ্ঞ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ঋগ্‌বেদের যুগের মত এ যুগেও যজ্ঞগুলো দু'টো শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এগুলো হচ্ছে 'গৃহ্য' ও 'শ্রৌত'। গৃহ্য সূত্রে পরবর্তীকালে বেশ কিছু যজ্ঞ অনুষ্ঠান সংকলিত করা হয়। যজ্ঞে সকাল ও সন্ধ্যায়, পূর্ণিমা-অমাবস্যায় আহুতি দান ছিল গৃহস্থের প্রতিদিনের কাজ। আবার জন্ম, বিয়ে, মৃত্যু, গৃহ নির্মাণ, পশুচারণ, কৃষিকর্ম ইত্যাদি বিষয়ের সাথেও যাগযজ্ঞ পালন করা হতো। এসব পূজায় কোন পুরোহিতের প্রয়োজন হতো না। গৃহস্থ নিজেই তা করতে পারতেন। অপরদিকে, শ্রৌত যজ্ঞ ছিল বেশ একটু জটিল। এসব যজ্ঞের জন্য বিশাল আয়োজন করা হতো। অনেক পুরোহিতের প্রয়োজন হতো এসব অনুষ্ঠানের জন্য।

বলিদান প্রথা

মন্ত্র পাঠের পাশাপাশি এ যুগে বলিদান প্রথা গুরুত্ব পায়

বৈদিক যুগে প্রায় ৪০ টি ধর্মীয় সংস্কারের কথা জানা যায়। বলা হতো, যাগযজ্ঞের পাশাপাশি এ যুগে নির্জন স্থানে শারীরিক কষ্ট স্বীকার করে ধ্যান করার মাধ্যমে সাফল্য লাভ করা যাবে। অন্যদিকে স্বর্গ পাওয়ার পথও খুলে যাবে। তবে, পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্যরা প্রধানত: জাগতিক লাভের জন্যই পূজা অর্চনা করতো। প্রার্থনা করার পদ্ধতিতেও কিছু পরিবর্তন আসে এ যুগে, মন্ত্র পাঠের পাশাপাশি এ যুগে বলিদান প্রথা গুরুত্ব পায়। ঘরের ভেতরে বা বাইরে বলিদান প্রথা চালু ছিল। খুব বড় মাপের যে সমস্ত বলিদান অনুষ্ঠান হতো সেখানে রাজাসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক উপস্থিত থাকতেন। ব্যক্তিগত বলিদানের অনুষ্ঠানগুলোর আয়োজন করা হতো গৃহস্থের বাড়িতে। সাধারণভাবে পশু বলি দেয়া হতো।

চতুরাশ্রম ঃ জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদ

পরবর্তী বৈদিক যুগে চারটি প্রথা বা আশ্রম পালনের কথা বলা হয়। এগুলো চতুরাশ্রম নামে পরিচিত। প্রথম আশ্রম হচ্ছে 'ব্রহ্মচর্য'। এই আশ্রমে শিক্ষার্থী গুরুগৃহে গিয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতো। দ্বিতীয় আশ্রমকে বলা হয় 'গার্হস্থ্য'। অর্থাৎ বিয়ে করে সংসার ধর্ম পালন করা। তৃতীয় আশ্রম হচ্ছে সাত্ত্বিক জীবন পালন করা। এতে বোঝায় সংসার ত্যাগ করে সমস্ত আনন্দ বিসর্জন দিয়ে সমাজ থেকে দূরে গিয়ে জীবনযাপন করা। চতুর্থ আশ্রম হচ্ছে সন্ন্যাস। সামাজিক দায়িত্ব শেষ করে এই আশ্রমবাসী সন্ন্যাস জীবন পালন করে। তবে, এই চতুরাশ্রম প্রধানত: উচ্চবিত্তের মানুষের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। এই ধরণের আশ্রম পালনের সাথে অর্থের প্রশ্ন জাড়িত ছিল। মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়ে এ সময় চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। মনে করা হতো মৃত্যুর পরেও জীবন আছে। পরলোকে পাপীরা পাবে শাস্তি আর

পূর্বজন্মের কর্মফল অনুযায়ী আত্মা পরজন্মের সুখ অথবা দু:খ ভোগ করবে। এ ধারণা থেকে 'কর্মবাদের' জন্ম হয়

পুণ্যবানদের দেয়া হবে পুরস্কার। এই ধারণা থেকেই আর্য সমাজে জন্মান্তরবাদের প্রচলন হয়। পূর্বজন্মের কর্মফল অনুযায়ী আত্মাপরজন্মের সুখ অথবা দু:খ ভোগ করবে। এ ধারণা থেকে 'কর্মবাদের' জন্ম হয়। কর্মবাদের ধারণা জাতিভেদ প্রথাকে সমর্থন করেছিল। বিশ্বাস মতে, কর্মফলের কারণে কেউ উচ্চবর্ণে আর কেউ নিম্ন বর্ণে জন্ম নেয়। এজন্যই মানুষ পরজন্মে ভাল থাকার আশায় বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালন করে থাকে।

সার-সংক্ষেপ

ঋগ্‌বেদ যুগের চেয়ে পরবর্তী বৈদিক যুগের ধর্মীয় কাঠামো কিছুটা ভিন্ন ছিল। এ যুগের প্রধান দেবতারা ঋগ্‌বেদ যুগের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ছিলেন না। পরবর্তী বৈদিক যুগের ধর্মে নানারকম আচার-আচরণ প্রবেশ করতে থাকে। আড়ম্বরপূর্ণ যাগযজ্ঞ লক্ষ করা যায়। এ সমস্ত যাগযজ্ঞের কোনটি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে করা হতো। আবার কোনটি পালন করা হতো বিশাল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। পরবর্তী বৈদিক যুগে আশ্রম প্রথার বিকাশ ঘটে। সমাজে চুতরাশ্রমের উপস্থিতি এ যুগের ধর্মের একটি বড় পরিচয় ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.৯

নৈর্ব্যক্তি প্রশ্ন

১। পরবর্তী বৈদিক যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেবতা হচ্ছেন–
ক. ইন্দ্র।
খ. প্রজাপতি।
গ. রুদ্র।

২। গৃহ্য ও শ্রৌত হচ্ছে–
ক. যজ্ঞের নাম।
খ. গৃহস্থের কাজের নাম।
গ. অনুষ্ঠানের নাম।

৩। পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্যরা পূজা করতো প্রধানত–
ক. রাজাকে সন্তুষ্ট করার জন্য।
খ. স্বর্গ পাওয়ার জন্য।
গ. জাগতিক লাভের জন্য।

৪। ব্রহ্মচর্য আশ্রমের অর্থ হচ্ছে–
ক. বিয়ে করে সংসার ধর্ম পালন করা।
খ. সন্ন্যাস ধর্ম পালন করা।
গ. শিক্ষার্থীর গুরুগৃহে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. পরবর্তী বৈদিক যুগের ধর্মে কি কি যাগযজ্ঞ পালন করা হতো? আলোচনা করুন।
২. পরবর্তী বৈদিক যুগের আশ্রম প্রথা সম্পর্কে বিবরণ দিন।
৩. বলিপ্রথা সম্বন্ধে একটি টীকা লিখুন।

পাঠ ১০

ঋগ্‌বেদ পরবর্তী আর্যদের অর্থনৈতিক অবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- পরবর্তী বৈদিক যুগের অর্থনীতিতে লৌহ-যুগের ভূমিকা কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পরবর্তী বৈদিক যুগের অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা কি তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- পরবর্তী বৈদিক যুগের ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কি ছিল তা বলতে পারবেন।
- পরবর্তী বৈদিক যুগে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।

লোহার ব্যবহার

ভারতে লোহার ব্যবহার খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দ থেকে শুরু হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়

ভারতে লোহার ব্যবহার খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দ থেকে শুরু হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সময়ের সমাধিস্থলে মৃতদেহের পাশে অনেক লোহার জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। এ ধরণের লোহার দ্রব্য পাওয়া গেছে বেলুচিস্তানে, পূর্ব পাঞ্জাবে, রাজস্থানে ও পশ্চিম-উত্তর প্রদেশে। ধারণা করা হয়, আর্যরা লোহার তৈরি অস্ত্রের সাহায্যে অনার্যদের পরাজিত করেছিল। লোহার তৈরি কুঠার দিয়ে তারা নদী তীরের বনভূমি পরিষ্কার করে তা কৃষিযোগ্য করে তোলে। বৈদিক গ্রন্থে এসব ধাতুর ব্যবহারের কথা জানা যায়।

যদিও, লোহার তৈরি কৃষি সরঞ্জাম খুব একটা পাওয়া যায়নি। পরবর্তী বৈদিক যুগে কৃষিকাজে লোহা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বৈদিক গ্রন্থে ষাঁড়ে টানা লাঙ্গলের উল্লেখ আছে। ধারণা করা হয়, এই লাঙ্গলের ফলা লোহা দিয়ে তৈরি করা হতো। এভাবে, লোহার ব্যবহার পরবর্তী বৈদিক যুগের অর্থনীতির ভিত্তি তৈরি করেছিল।

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি

বৈদিক সভ্যতায় অর্থনীতি কৃষি কেন্দ্রিক ছিল

বৈদিক সভ্যতায় অর্থনীতি কৃষি কেন্দ্রিক ছিল। এ সময়ে কাঠের তৈরি লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ হতো। আপনারা জেনেছেন, এসব লাঙ্গলের ফলা ছিল লোহার তৈরি এবং তা ষাঁড় দিয়ে টানানো হতো। পরবর্তী বৈদিক যুগের এই চাষ পদ্ধতি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। নদী-তীরের মাটি ছিল নরম। তাই এসব লাঙ্গল দিয়ে চাষ করা ছিল খুব সহজ। আপনারা পাঠ- ৯ এ জেনেছেন বলিদান প্রথা প্রচলিত থাকায় অনেক গবাদি পশু ধ্বংস হয়েছিল। তবে, কৃষিকাজ যে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল তা বুঝা যায় 'শতপথ ব্রাহ্মণ' গ্রন্থ থেকে। এই গ্রন্থে কৃষিকাজ সংক্রান্ত বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীন গল্প কাহিনী অনুসারে বিদেহ-র রাজা ও সীতার পিতা 'জনক' লাঙ্গলে হাত লাগিয়েছিলেন। বোঝা যায়, সে যুগে রাজা ও রাজপুত্র রাও কৃষিকাজে শ্রম দিতেন। পরবর্তীকালে অবশ্য উচ্চ বর্ণের লোকদের লাঙ্গল টানা নিষিদ্ধ ছিল।

প্রধান খাদ্যশস্য 'গম'

বৈদিক গ্রন্থে, ধানকে লেখা হতো 'ব্রিহি'

ঋগ্‌বৈদিক যুগে মানুষের প্রধান উৎপাদন ছিল বার্লি। পাশাপাশি ধান ও গম উৎপাদিত হতো। পরবর্তী বৈদিক যুগে পাঞ্জাব ও পশ্চিম উত্তর প্রদেশের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য হয়ে দাঁড়ায় গম। দোয়াব অঞ্চলে হতে থাকে ধান। বৈদিক গ্রন্থে, ধানকে লেখা হতো 'ব্রিহি'। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে গমের বদলে চাল ব্যবহার করা হতো। এসব তথ্য থেকে মনে করা হয় পরবর্তী বৈদিক যুগের মানুষ প্রধানত কৃষিজীবী ছিল।

বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ঃ নগরের উদ্ভব

সমাজে কর্মকার, সূত্রধর, স্বর্ণকার, কুমার প্রভৃতি পেশার লোকের অবস্থান ছিল

আগেই বলা হয়েছে, বৈদিক সভ্যতায় অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক। কিন্তু, পরবর্তী বৈদিক যুগে ধীরে ধীরে শহর গড়ে উঠলে কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিকাশ লক্ষ করা যায়। পশম ও তুলার বস্ত্র বয়ন ছিল প্রধান শিল্পকর্ম। সমাজে কর্মকার, সূত্রধর, স্বর্ণকার, কুমার প্রভৃতি পেশার লোকের অবস্থান ছিল। অর্থাৎ, পরবর্তী বৈদিক যুগের অর্থনীতিতে বিভিন্ন শিল্প দ্রব্যের ভূমিকা ছিল। এ যুগে মহিলারাই সাধারণত: তাঁত বোনার কাজ করতো। বস্ত্র বয়ন শিল্পের গুরুত্ব ক্রমে খুব বৃদ্ধি পায়। চর্মশিল্প ও কাঠ

শিল্পেরও ব্যাপক বিকাশ ঘটেছিল। পরবর্তী বৈদিক যুগে চার ধরণের মাটির পাত্র তৈরি হতো। কালো-লাল পাত্র, কালো পাত্র, ধূসর রং-এর আঁকা পাত্র এবং লাল পাত্র। লাল মাটির তৈরি পাত্র এই যুগের মানুষের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল এবং পশ্চিম-উত্তর প্রদেশের প্রায় সর্বত্র এই ধরণের পাত্র পাওয়া গেছে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল ধূসর বর্ণের পাত্রগুলো। এগুলোর গায়ে চিত্র অঙ্কন করা হতো। আবিষ্কৃত এই সমস্ত নিদর্শন এবং বৈদিক গ্রন্থ থেকে মোটামুটি ধারণা নেয়া যায় যে, এই যুগে কারিগরি শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। পরবর্তী বৈদিক যুগে দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। নদীপথে চলাচলের জন্য নৌকা ব্যবহার করা হয়। পরবর্তী বৈদিক অর্থনীতি দাস শ্রমের উপর নির্ভরশীল ছিল না। এ যুগে 'নিষ্ক' নামে এক প্রকার স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল। পরবর্তী বৈদিক যুগের শেষদিকে নগর গড়ে উঠেছিল বলে সাহিত্যের সূত্র থেকে জানা যায়। এ যুগের নগরকে সম্পূর্ণ নয়-বরঞ্চ আধা নগর বলা যেতে পারে। বৈদিক সাহিত্যে সমুদ্র ও সমুদ্র যাত্রার বর্ণনা আছে। অনুমান করা হয় এ যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো এবং তার ফলে কারিগরি শিল্পের বিকাশ ঘটা সম্ভব হয়েছিল।

এ যুগে 'নিষ্ক' নামে এক প্রকার স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল

সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবন

পরবর্তী বৈদিক যুগের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে খুব সামান্যই ধারণা পাওয়া যায়। তবুও, উপরের তথ্যগুলোর আলোকে অনুমান করা যায় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল এ যুগে। ঋগ্‌বৈদিক যুগের পশুপালন ভিত্তিক সমাজে পরিবর্তন আসে। তার বদলে মানুষের জীবনব্যবস্থার প্রধান উৎস হয় কৃষিকাজ। এভাবে আধা যাযাবর আর্যদের জীবনে আসে স্থায়িত্ব। কৃষি ও শিল্পকলার উন্নতির মধ্য দিয়ে যে সমৃদ্ধি আসে তার উপর ভিত্তি করে সমতল ভূমিতে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে দেয়। কৃষকরা যা উৎপাদন করতো তা তাদের ভরণ-পোষণের জন্য যথেষ্ট ছিল। তবে, রাজা ও পুরোহিতদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে তাদের হাতে খুব একটা উদ্বৃত্ত ফসল থাকতো না।

জীবনব্যবস্থার প্রধান উৎস হয় কৃষিকাজ। এভাবে আধা যাযাবর আর্যদের জীবনে আসে স্থায়িত্ব

সার-সংক্ষেপ

পরবর্তী বৈদিক যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল ঋগ্‌বেদিক যুগ থেকে কিছুটা ভিন্ন। এ যুগে লোহার ব্যবহার হওয়ায় কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব হয়। লোহার ফলা লাঙ্গলে ব্যবহার করায় জমি চাষে গতি সৃষ্টি হয়। উৎপাদন ব্যবস্থায় এই পরিবর্তনের কারণে পশুপালক আর্যরা কৃষি সভ্যতার মধ্য দিয়ে স্থায়ী জীবন গড়ে তুলতে থাকে। কৃষি ছাড়াও বিভিন্ন শিল্পের বিকাশ ঘটে পরবর্তী বৈদিক যুগে। এসবের মধ্য দিয়ে এ যুগের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থায় আসে নতুন গতি। শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিকাশ, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি-এ সবের কারণে উদ্ভব ঘটতে থাকে নগরের।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.১০

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। ভারতে লোহার ব্যবহার শুরু হয়েছিল–
   ক. খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দ থেকে।
   খ. খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দ থেকে।
   গ. ২০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে।

২। বিদেহ-র রাজার নাম–
   ক. শতপথ ব্রাহ্মণ।
   খ. জনক।
   গ. ব্রিহি।

৩। পরবর্তী বৈদিক যুগে তাঁত বোনার কাজ করত প্রধানত–
   ক. বৈশ্যরা।
   খ. পুরুষরা।
   গ. মহিলারা।

৪। 'নিষ্ক' হচ্ছে–
খ. ধানের অপর নাম।
খ. স্বর্ণমুদ্রার নাম।
গ. একটি যজ্ঞের নাম।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. পরবর্তী বৈদিক যুগে কৃষির অবস্থা কেমন ছিল তা বর্ণনা করুন।
২. পরবর্তী বৈদিক যুগের অর্থনীতিতে লৌহ যুগের ভূমিকা আলোচনা করুন।
৩. পরবর্তী বৈদিক যুগে বিভিন্ন শিল্পের উদ্ভব সম্বন্ধে বর্ণনা দিন।

পাঠ ১১

বৈদিক সংস্কৃতি বিস্তার।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কিভাবে বৈদিক সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- রামায়ণ মহাভারতের কাহিণী মধ্য দিয়ে বৈদিক সভ্যতা বিস্তারের সূত্র বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- বৈদিক যুগের ধাতু সংস্কৃতির বিকাশ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

রাজা 'জনক' এর ভূমিকা

বৈদিক সভ্যতার শেষদিকে আর্যরা রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেয়। ক্রমে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে তাদের প্রভাব বিস্তৃত হতে থাকে। নতুন রাজ্য স্থাপিত হয় কোশল ও কাশী অঞ্চলে। আরও একটি প্রভাবশালী রাজ্যের নাম ছিল বিদেহ। বিদেহ-র রাজা ছিলেন জনক। জনক সন্ন্যাসী, পর্যটক ও দার্শনিকদের সাহায্য করতেন। তাঁদের সাথে ধর্মীয় আলোচনায় রাজা জনকও অংশ গ্রহণ করতেন। জনকের রাজ্যের অবসান ঘটে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে। এভাবে, তাঁর রাজধানী শহর মিথিলার গুরুত্ব লোপ পায়। রাজা জনকের পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া সন্ন্যাসী ও দার্শনিকগণ বৈদিক সংস্কৃতি প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। বিদেহ-র দক্ষিণে ছিল মগধ অঞ্চল। তখনও মগধ সম্পূর্ণভাবে আর্যদের প্রভাবাধীনে আসেনি। মগধের পূর্বদিকে আধুনিক বাংলার সীমানায় 'অঙ্গ' নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। এ সময় আর্য সভ্যতার বাইরে ছিল অঙ্গ, বঙ্গ ও আসাম।

মগধের পূর্বদিকে আধুনিক বাংলার সীমানায় 'অঙ্গ' নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। এ সময় আর্য সভ্যতার বাইরে ছিল অঙ্গ, বঙ্গ ও আসাম

আর্যরা মালব নামের স্থানে বসতি স্থাপন করে এবং তাদের যাতায়াত প্রসারিত হয় নর্মদা অঞ্চল পর্যন্ত। এখানে ছিল 'মহিষমতি' নামে এক বিখ্যাত শহর। ধারণা করা হয়, উত্তর-পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের অংশসমূহে আর্যদের প্রভাব পড়ে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রাধান্য বিস্তার করতে গিয়ে তারা তাদের আদি বাসস্থানের কথা ভুলে যায়।

রামায়ণ ও মহাভারত

পরবর্তী বৈদিক যুগের শেষদিকে রচিত হয় রামায়ণ ও মহাভারত নামে দুই মহাকাব্য। রামায়ণের মূল রচয়িতা হিসাবে কবি বাল্মিকীর নাম করা হয়। মহাভারতের রচয়িতা হিসাবে বলা হয় কবি ব্যাসের নাম। তবে, পণ্ডিতদের মতে, মহাকাব্য দু'টো কোন এক নির্দিষ্ট যুগে রচিত হয়নি। তাই রচয়িতাও নির্দিষ্ট কোন কবি নন। যুগে যুগে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীতে পরিবর্তন ও সংযোজন করা হয়েছে। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, খ্রিস্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর পর মহাকাব্য দু'টো বর্তমান রূপে লিখিত হয়েছে। ধারণা করা হয় এ সময়েরও ছয়শ অথবা আটশ বছর আগে মহাকাব্য দু'টো লিখিত হয়েছিল। আধুনিককালের ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপার মনে করেন, রামায়ণ-মহাভারত লিখিত হয়েছে ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, পান্ডব ও কৌরব বলে দু'টো জাতি ছিল; যাদের রাজধানী ছিল হস্তিনাপুর। হস্তিনাপুরে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ খননকার্য চালিয়েছেন। এখানে প্রাপ্ত দ্রব্য সামগ্রী থেকে তাঁদের অনুমান মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৯০০ অব্দে।

যুগে যুগে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীতে পরিবর্তন ও সংযোজন করা হয়েছে

আধুনিককালের ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপার মনে করেন, রামায়ণ-মহাভারত লিখিত হয়েছে ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে

রামায়ণ অনুসরণে আর্য সভ্যতার কেন্দ্র ঃ মহাভারতের বর্ণনা

রামায়ণের কাহিনী সূচনাকালে আর্য সভ্যতার কেন্দ্র ছিল গাঙ্গেয় উপত্যকা। রামায়ণ থেকে জানা যায় রাবণের সাথে যুদ্ধ করে রাম দক্ষিণ ভারতে আর্য সভ্যতার বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। মহাভারতের বিবরণ থেকে বুঝা যায়- সমগ্র ভারতবর্ষেই বৈদিক সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল। এই মহাকাব্যের বর্ণনা অনুযায়ী যাদবদের একটি শাখা সৌরাষ্ট্রে প্রাধান্য স্থাপন করে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজারা কৌরব-পান্ডব যুদ্ধে যোগদান করেন। মহাকাব্য থেকে জানা যায়, রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করতেন শক্তিশালী রাজারা। যুদ্ধবিগ্রহ থেকে অনুমান করা যায় বৈদিক যুগের শেষদিকে ক্ষত্রিয় বর্ণের লোকেরা শক্তিশালী হয়ে পড়ে। ধারণা করা হয়, ৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পূর্বেই সমগ্র ভারতবর্ষে আর্যরা তাদের প্রভাব বিস্তার সম্পন্ন করে।

ধারণা করা হয়, ৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পূর্বেই সমগ্র ভারতবর্ষে আর্যরা তাদের প্রভাব বিস্তার সম্পন্ন করে

ধাতু সংস্কৃতি

ঋগ্‌বেদে ধাতু হিসেবে সোনা, তামা ও ব্রোঞ্জের উল্লেখ আছে। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে টিন, সীসা, রূপা ও লোহার উল্লেখ পাওয়া যায়। যজুবেদে 'কালো ব্রোঞ্জের' কথা আছে। আপনারা আগেই জেনেছেন, প্রত্নতত্ত্ববিদগণ খনন করে হস্তিনাপুর, অহিচ্ছত্র ও কৌশাম্বী নামের শহর আবিষ্কার করেছেন। এগুলোকে পরবর্তী বৈদিক যুগের শহর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কৌশাম্বীতে পাওয়া গেছে লোহা। আরও অনেক আর্য বসতিতে লোহার দ্রব্যাদি পাওয়া গেছে। এভাবে মনে করা হয় আর্যরা ধাতু সংস্কৃতিতে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছিল। লোহা ব্যবহারের কারণে আর্যরা দ্র□ত *প্রাধান্য* বিস্তার করতে সক্ষম হয়। আপনারা পাঠ- ৬ এ জেনেছেন লোহার কৃষি উপকরণ তৈরি করে আর্যরা কৃষি সভ্যতাকে গতিশীল করেছিল। লোহা কারিগরি বিদ্যার উন্নতি ঘটায় একদিকে শিল্পের বিকাশ ঘটে, অন্যদিকে উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আসে ব্যাপক উন্নতি।

সার-সংক্ষেপ

আর্য সভ্যতা নির্দিষ্ট জায়গায় সীমাবদ্ধ ছিল না। সময়ের সাথে সাথে তা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কৃষিভিত্তিক সভ্যতার ধারক হলেও পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্যরা কোথাও কোথাও গড়ে তুলতে থাকে নগর। বিখ্যাত মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত রচিত হয়েছিল বৈদিক যুগের শেষদিকে। এই মহাকাব্য দু'টোর বর্ণনার ভেতর থেকে পন্ডিতগণ বৈদিক সংস্কৃতি বিস্তারের একটি ছবি খুঁজে পেয়েছেন। বৈদিক যুগে লোহা সহ বিভিন্ন ধাতুর সাথে পরিচয় ঘটে আর্যদের। এই ধাতুর ব্যবহার আর্যসংস্কৃতিকে আরও গতিশীল করেছিল। এভাবে, আর্যসভ্যতা গড়ে তুলেছিল একটি ধাতু সংস্কৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.১১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। জনক এর রাজ্যের অবসান ঘটেছিল–
   ক. গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে।
   খ. গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের সময়।
   গ. গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পরে।

২। নর্মদা অঞ্চলে আর্যদের গড়ে তোলা শহরটির নাম–
   ক. অঙ্গ।
   খ. আসাম।
   গ. মহিষমতি।

৩। মনে করা হয় রামায়ণের রচয়িতা ছিলেন–
   ক. কবি বাল্মিকী।
   খ. কবি ব্যাস।
   গ. রোমিলা থাপার।

৪। আর্যরা সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে–
   ক. ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।
   খ. ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।
   গ. ৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পূর্বে।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ভারতে বৈদিক সংস্কৃতি কিভাবে ছাড়িয়ে পড়েছিল?
২. বৈদিক যুগে ধাতু সংস্কৃতির বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৪ : রচনামূলক প্রশ্ন

১. আর্যদের পরিচয় দিন। আর্যদের আদিবাস কোথায় ছিল এবং কিভাবে তারা ভারতবর্ষে আগমন করে তা আলোচনা করুন।
২. ঋগ্‌বৈদিক যুগে আর্যদের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অর্থনেতিক অবস্থার বর্ণনা দিন।
৩. পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্যদের অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন কেমন ছিল? এই প্রসঙ্গে ভারতে বৈদিক সংস্কৃতির বিস্তার সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৩. বিভিন্ন প্রকার বৈদিক সাহিত্যের বর্ণনা দিন।
৪. ঋগ্‌বেদ যুগের প্রশাসন সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
৫. ঋগ্‌বৈদিক যুগের অর্থনীতিতে পশু সম্পদ কি ভূমিকা রেখেছে তা আলোচনা করুন।
৬. ঋগ্‌বৈদিক যুগের কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধে বর্ণনা দিন।

উত্তরমালা

পাঠ ৪.১	ঃ	১। খ	২। ক	৩। গ	৪। ক
পাঠ ৪.২	ঃ	১। গ	২। গ	৩। খ	৪। খ
পাঠ ৪.৩	ঃ	১। ক	২। গ	৩। ক	৪। খ
পাঠ ৪.৪.	ঃ	১। ক	২। গ	৩। খ	৪। ক
পাঠ ৪.৫	ঃ	১। গ	২। ক	৩। গ	৪। ক
পাঠ ৪.৬	ঃ	১। ক	২। গ	৩। গ	৪। খ
পাঠ ৪.৭	ঃ	১। গ	২। ক	৩। গ	৪। গ
পাঠ ৪.৮	ঃ	১। গ	২। খ	৩। গ	৪। খ
পাঠ ৪.৯	ঃ	১। খ	২। ক	৩। গ	৪। গ
পাঠ ৪.১০	ঃ	১। ক	২। খ	৩। গ	৪। খ
পাঠ ৪.১১	ঃ	১। ক	২। গ	৩। ক	৪। গ